

আল্লামা ইকবাল

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী



আল্লামা ইকবাল

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল্লামা ইকবাল : মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী ॥ ই.ফা.বা. প্রকাশনা :
 ১৩৬০ ॥ ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ৯২৮, ৯১৪'৩ ॥ প্রথম প্রকাশ :
 রুবিউল সানী ১৪০৭, পৌষ ১৩৯৩, ডিসেম্বর ১৯৮৬ ॥ প্রকাশনায় :
 অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
 বাংলাদেশ, বাহুবল মুকাররম, ঢাকা-২, বাংলাদেশ ॥ প্রচ্ছদ অংকনে :
 রফিকুল ইসলাম ॥ মূল্য : সুয়েরা বেগম চৌধুরী, রাহীশান প্রেস,
 ২২৩, মালিবাগ, ঢাকা-১৭ ॥ বাঁধাইয়ে : জাকির এত্ত সন্স ॥ ৮,
 বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা-১ ॥

মূল্য : বাইশ টাকা

Allama Iqbal : (Life and Thoughts of Dr. Muhammad Iqbal)
 written in Bengali by Muhammad Abu Taher Siddique,
 Published by the Islamic Foundation Bangladesh.

December 1983,

Price ; Taka. 22-00 , U. S. Dollar ; 2-00

মরহুম দাদা ভান
জীব আফজল আলীর
রাহের মাপফিরাত
কামনা

আল্লামা ইকবাল

সবক পড় ফের সাক্ত কা তুজা'আত কা আদালত কা
লিয়ে জায়েগা তুজ সে কাম দুনিয়া কি ইমামত কা

প্রকাশকের কথা

জাতীয় উত্তরণে শতাব্দীর চিন্তাশ্রমগত আলোড়ন সৃষ্টি-কারী মৃগশ্রেষ্ঠ মনীষী আজ্জামা ইকবালের মহান অবদানের বাণীকে কোনে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের অবশ্যই এটি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এই মহান কবি-দার্শনিকের জীবন ও পয়গামের মথামথ মূল্যায়ন সম্বলিত পুস্তকের সংখ্যা বাংলা ভাষায় কম। অথচ এই কবি ও মহান সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় আমাদের জাতীয় উত্থানের স্বার্থেই প্রয়োজন।

এ দুটিটুকোণকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আজ্জামা ইকবালের জীবন ও দর্শনকে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে। জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকীর ‘আজ্জামা ইকবাল’ গ্রন্থে ইকবাল-উপস্থাপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এ থেকে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা ইকবাল সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন আশা করা যায়।

এদেশে ইকবাল-চর্চার ক্ষীণ ধারার সাথে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একটি বেগবান উবিষ্যতের ইঙ্গিতবহু সংযোজন হিসেবে আমরা পেশ করছি।

ভূমিকা

মহাকবি ইকবাল এ উপমহাদেশে এক অগ্ৰি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবি, দার্শনিক, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর অবদান চিরকালই অবিমরনীয়। এ অঞ্চলে তিনি প্রধানত পাকিস্তানের স্বপ্ন-চলটা হিসাবে পরিচিত হলেও—আজ বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি সূচরিত হচ্ছে। ইসলামী প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন কালে যে সব মতবাদ প্রবেশ করে তাতে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল—তিনি সেগুলোর যথাযথ বিচার করে তাদের যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইমাম গাজ্বালীর অনুরূপ। তবে ইসলামের ব্যাঘ্যা ও উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন—তাঁও অভিনব দার্শনিক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্ব জগতে তাঁকে একটা শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। এ বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র তিনি গতিশীল জীবনের সজ্জান পেয়েছেন এবং আত্মাঙ্কও তিনি চরম এক সৃষ্টিশীল সত্তা বলে লাভ করেছেন। তাঁর অবদানের অপর শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে খুদী—যা মানব সাধারণকে তার বিকাশের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ পথান্তে নিয়ে যায়।

তাঁর এবংবিধ মতবাদই তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব ধারণা এ বিশ্বের ইতিহাসে সম্পূর্ণই অভিনব এবং এ দুনিয়া তাঁর এ সকল অবদানের জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য সর্বসাধারণ পাঠকের বিশেষত কোমলমতি বাচ্চ-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর আগ্রহ সকল দেশেই রয়েছে। মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী বাংলা ভাষাতাত্ত্বী পাঠক-পাঠিকা বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে তাঁর জীবনী রচনা করে দেশবাসীর প্রতি তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করে এ পুস্তক রচনা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর এ পরিশ্রয় সার্থক হয়েছে এবং তা দেশের সর্বত্রই যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করবে।

লেখকের কথা

বিষয়বিশুদ্ধ কালজয়ী ব্যক্তিত্ব আজামা ওঃ মুহাম্মদ ইকবাল। তাঁর অমর কাব্য তাঁকে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও দূর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছে। জানী-ভগী ও সুধীমহলে তিনি সার্বজনীনভাবে সমাদৃত। জ্ঞান সাধনায় তিনি যেমন ছিলেন অতুল ভূবুরী, তাঁর কলমও ছিল তেমনি ক্ষুরধার। পাকিত্য যেমন তাঁর শীর্ষস্থানীয়, বাণীও তেমনি মহামূল্যবান—সার্বজনীন মূলবোধের নীতি নির্ধারক।

নিহক একজন মহৎ কবি নন তিনি, বরং একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ অবদান চির শ্রদ্ধেয়। বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর বাণী ও কাব্য চিরদিন আলোক-বতিকা হয়ে থাকবে।

ছাত্র জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কবির ‘তারানা-ই-মিল্লা’ আবৃত্তি শুনে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগে। সঙ্গীতের মর্মার্থ না বুঝলেও সুরের মুগ্ধনায় বিমোহিত হয়ে পড়তাম। মুহুর্তম শিক্ষকদের কাছে ইকবাল সম্পর্কিত অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনে আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম। তাঁর অবিঃসরণীয় কাব্য-শক্তি ও মোগাতা আমাকে নতুন চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত করতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনার সুযোগ হয়নি।

১৯৮৩ সালে ইকবালের ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ‘স্মরণিকা ও আয়োজিত সভা থেকে আমি কবি সম্পর্কে নতুন ধারণা পাই। উক্ত ‘স্মরণিকা’ ‘আজামা ইকবাল : জীবনধর্মী ও গ্রন্থাবলী’ শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। আয়োজিত সভার বক্তাদের সারগর্ভ আলোচনায় আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও আমাদের দেশে ইকবাল চর্চার দৈন্যের জন্য মর্ষাহত হই। বলতে গেলে তখন থেকেই আমি কবি সম্পর্কে কিছু লেখার সংকল্পবদ্ধ হই। আমার বর্তমান বইটি সেই সংকল্পের বাস্তব রূপ।

আল্লামা ইকবালের কালজয়ী খনীষা সম্পর্কে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে কিছু লেখা খুঁটতামনে হতে পারে। তবুও দুটি কারণে আমি এ কাজে হাত দিয়েছি। প্রথমত, এ দেশের প্রতিষ্ঠাপন সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় পরিবর্তিত রূপে আরো সুসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নে এগিয়ে আসবেন বলে যিনীত আশা করছি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সাহিত্যমোদীরা ইকবালের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক গুরুত্ব দিতে পারবেন। ঐদৃষ্টো আশা আমার প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমত প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থের অভাবে বাধাগ্রস্ত হই। এ বাধা উত্তরণের ক্ষেত্রে পরম প্রজ্ঞার সাথে সম্মরণ করছি স্বনামধন্য কবি-সমন্বিতক আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (তিনি বই প্রকাশের সপ্তাহ তিনেক আগে ইন্তেকাস করেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল হু ও জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরীর কথা। তাঁরা আমাকে কল্লকলি রেফারেন্স বই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিত্ব হলেও সত্যি যে, দেশের সাধারণ গ্রন্থপারভ্রমণে আল্লামা ইকবালের রচনাবলী ও তাঁর উপর রচিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রতুল। ফলে শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই বইয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পাইনি। সুস্থের বিহীন সম্প্রতি সিন্ধুতে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ লাইব্রেরীতে বেগ কিছু দৃশ্যপট গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। উক্ত গ্রন্থগুলো থেকে রেফারেন্স নিতে পরবর্তী সংকরণে সংযোজিত করার ইচ্ছে রয়েছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক দেওরান মোহাম্মদ আওরক শারীফিক অসুস্থতার মধ্যেও অনেক কষ্ট স্বীকার করে পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া ঐর্ষ্যসহকারে পড়ে বইয়ের তুমিক। লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। বই প্রকাশের এই শুভ মুহুর্তে আজ তাঁকে জানাই সন্তান তসলিম ও মুবারকবাদ। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের ও দীর্ঘায়ু দান করুন।

বর্তমান বইখানিতে সৈয়দ আবদুল মাদান অনুদিত অসরার খুদী, আবদুল ফতাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফকরী অনুদিত রুমুযে

বেশুদী, মাওলানা তমীযুর রহমান অনুদিত শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, মনীর উদ্দীন ইউসুফ অনুদিত বাজে দরার কাল্যানুবাদ গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছে আমি অপরিণোদা ধণে আনজ।

তথ্য সংগ্রহে যে সব লেখকের বইয়ের সহযোগিতা নিয়েছি তাঁদের মধ্যে মারা ইজেকান করেছেন তাঁদের রাহের মাগফিরাত এবং মারা বেঁচে আছেন তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব নূরুল হক (মুসাদক, আল-ইসলাহ), জনাব মসউদ-উশ-শহীদ, কালাম ডাই, কাশেম ডাই ও ইউনুস ডাইয়ের মে সহযোগিতা পেয়েছি, তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমার কাঁচা হাতের লেখা বিধায় কোন প্রকার ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের গঠনমূলক পরামর্শ পেলে বইয়ের মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। বইটি পড়ে সুদী পাঠক-পাঠিকা যদি আল্লামা ইকবালের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছুত হলেও জানতে পারেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃ-পক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই।

সূচী

প্রথম অধ্যায় :	প্রারম্ভিক কথা ॥	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ইকবালের আবির্ভাব : ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ॥	১১
তৃতীয় অধ্যায় :	'সৌভাগ্যের' সূর্যোদয় ॥	২৩
চতুর্থ অধ্যায় :	বাল্য জীবন ॥	২৮
পঞ্চম অধ্যায় :	শিক্ষা জীবন ॥	৩১
ষষ্ঠ অধ্যায় :	ইউরোপে ॥	৩৮
সপ্তম অধ্যায় :	কাব্য চর্চা ও স্বীকৃতি ॥	৪১
অষ্টম অধ্যায় :	রাজনীতির মগ্নদানে ॥	৪৬
নবম অধ্যায় :	পারিবারিক জীবন ॥	৫১
দশম অধ্যায় :	বিদেশ সফর ॥	৫৩
একাদশ অধ্যায় :	স্বাধীনতার দর্শন-তত্ত্ব ॥	৫৭
দ্বাদশ অধ্যায় :	জীবন সায়াহ্নে ॥	৬০
অতিরিক্ত :	ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি ॥	৭৩
	: বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা ॥	৯৩
	: পাল্টাতো ইকবাল-চর্চা ॥	৯৮
	: ইকবাল-রচনাবলী ॥	১০০
	: জীবনপঞ্জী ॥	১০৩
	: গ্রন্থপঞ্জী ॥	১০৮

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক কথা

খ্রিষ্ট শতাব্দীর ইসলামী রেনেসাঁর মহান দিকনাগ আজামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। বিশ্ব-ইতিহাসের এই জগজগত মহাপুরুষ, মুগস্পৃষ্টা কবি দার্শনিক-এর অবদান সার্বজনীন স্বীকৃতি-ধন্য।

মুসলিম মিহনাতের পরাধীনতার এক দুর্যোগপূর্ণ মুহর্তে এই মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ইসলামী উরাহর বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাতে ভগ্নন মহাসংকটকাল চেনছিল। উপমহাদেশ তথা এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটির অধিকাংশই ছিলো পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। নিজেদের হস্তান্তর ও অস্বাভাবিক ফলে তাপ্তী শক্তির স্বত্বাধীনতা এই জাতির ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। ভোগ-বিলাসিতা ও দায়িত্বহীনতার লক্ষন নেতৃত্বের আসন থেকে তারা দূরে ছিটকে পড়ে—সুত্র হয় দুঃখিত্ব জ্বলন্ত জীবন।

মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের মুগসজ্জিত কুরআনের জুমিকা ছিল জননা। এটাকে গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনে উত্থান ও পতনের দুই প্রান্তের সূচী হয়েছিল। ইকবাল খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগের অবদান থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিম মিহনাতের চরম অধঃপতন ও ন্যস্তারজনক গোলামীর পেছনে মূল কারণ খুঁজতে নিয়ে এ সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেকাল জার একালের মধ্যে কুরআনের ভিত্তিতেই পার্থক্য সূচিত করেন। মর্মান্বণী ভাষায় তিনি বলেন :

وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر
اور توہین خوار ہوئے قارکِ ایران ہو کر

মুসলমানী নিয়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে
আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে।

বিদায় হজ্জের ভাষনে রসুলুলাহ্ (সঃ) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের বিশাল সমাবেশে 'বিস্ব-মানবতার মহাসনদ' ঘোষণায় বঙ্গ-নির্বোধে বলে-
ছিলেন :

জাহেলিয়াতের সব বিধি-বিধান আমার পায়ের তলে রাখলাম।
..... আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ
পর্যন্ত তোমরা এদু'টোকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবো
না। এ দু'টো জিনিস হলো—আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাহ্।

[সিহাহ্ সিদ্দাহ্]

কুরআন মুসলমানদের জীবনী-শক্তি। এর বাস্তব অনুসরণের মধ্যেই
তাদের পাখি ও পরকালীন সাফল্য নির্ভরশীল। বস্তুবাদ-অড়বাদ-ভোগ-
বাদের শিকার হয়ে মুসলমানরা অধঃপতিত জাতির দূর্ভাগ্য বরণ করে
সমাজের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে
মুক্তির পথ দেখাতে পারে একমাত্র হেয়ার রৌশনী—আল-কুরআন। তাই
ইকবাল জাতিকে পথ-নির্দেশ করে বলেছেন :

ای مسلمان گر تو خواهی زیستن

بست دامن جز به قرآن زیستن

হে মুসলিম! তোমরা যদি জুতল মাঝে

বাঁচতে সবি চাও

কুরআন ছাড়া মুক্তি রূখা

এটা মেনে নাও।

ইকবাল কুরআনের শাস্ত্র বাণীর আলোকে জীবন্ত জাতির হাত
স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আহ্বাস-বাণীর শুনিয়েছেন :

هم تو مائل به کرم ہیں

کوی مائل تو لہیں

راہ دیکھلائیں کہے راہ رو

منزل ہی نہیں

قرآن عام تو ہے

جوہر قابل ہی نہیں
 جس سے تعمیر ہو ان م
 کی یہ وہ غل ہی نہیں
 کوئی قابل ہو تو ہم
 شان کئے دینے ہیں
 دوڑنے والوں کو دنیا
 بھی لٹی دینے ہیں

দান করিতে প্রবৃত্ত আমি
 কিন্তু কেহ প্রার্থী তো নেই
 পথ দেখাবো বল কারে
 মনষিগের পথিক যে নাই।
 শিক্ষা আমার সার্বজনীন
 কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
 আদম যাতে সৃষ্টি হল,
 সেই উপাদান এখন যে নাই।
 যোগ্য গেলে রাজার মত
 সম্বাসিত করি তারে,
 তালান যারা করতে জানে—
 নূতন জগত দেই তাদের ॥

আল্লাহ্ তাহালা কুরআন মক্কীয়ে সত্য-ন্যায়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ
 মু'মিনদেরকে হতাশামুক্ত জীবন ও বিজয় দোরবের সুপংবাদ দিয়েছেন।
 ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না। যদি তোমরা মু'মিন
 হতে পারো, তাহলে তোমরাই বিজয়ী। [সূরা আল ইমরান : ১৩৯]
 আরো ইরশাদ হয়েছে :

أَنْ أَرْضَ بِرَبِّهَا مِنْ عِبَادِيَ الْهَادُونَ -

আমার সৎকর্মশীল (সালেহ) বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

[সূরা আঘিয়া : ১০৪]

বিশ্ব নেকত্বের আসনে সমানীন হতে হলে সর্বাপ্রণে প্রয়োজন তান, যোগ্যতা, সৃজনশীল প্রতিভা ও অসমাপ্তহার। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فَسَادٌ -

—মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই।

[সূরা নাজম : ৩৯]

الَّذِينَ جَاءُوا فِينَا لِيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে আমার সূত্রে অনুগৃহীত করি।

[সূরা আনকাবুত : ৬৯]

ইকবাল ডান-কুরআনের উবরিউক্ত বানীর প্রতিধ্বনি করেছেন নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে :

هر كـ. أورا تريت تـلـيـقـ نـيـسـت

شـ. ١٠ حز كا نـر و زلـلـتـ تـ

নেই সৃজনী প্রতিভা যার

মোদের কাছে সে কিছু নয়,

কাফির ও যিমদিক, তাহার

আব তো কিছু নাই পরিচয়।

পরাদীন রাষ্ট্রভাষ্যে বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আল্লাসনে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি কমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। পাল্চাতা জড়বাদী দর্শনের সফলভাবে মুগ্ধমানদের আকীসা-বিশ্বাসে ঘূন ধরেছিল। নৈতিক অবক্ষয়ের

ধস্ নেমেছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। চূড়ান্ত পতনের মুগ্ধোন্মুগ্ন মুসলিম
আত্মির দুর্দশা দেখে ইকবাল মর্মবেদনায় জ্বালাময়ী ভাবায় গাউলেন :

سِرِّزِ مے ہو گئی دینا
مے مسلمان قابود
عم نہ کہتے ہیں کہ تھے یہی
کھوں مسلم موجود
وضع ون تم ہو نصاری
تو تملن میں ہنود
یہ مسلمان مے جنہیں دیکھ کے
شرمائیں ہنود

উঠেছে শোর আজি ধরণী বক্ষে
‘মুসলিম আর নাহিক’ হায় ।
তুনে হাসি পায় নাহিক’ এখন
কবে মুসলিম ছিল ধরায় ?
রীতি-নীতি তব স্বপ্টান সম,
হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,—
এই কি হে সেই মুসলিম যারে
ইহদীও দেখি লজ্জা পায় ?

পরাদীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে ভাপুত্রী শক্তির অনুমতি সাপেক্ষে
কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব
বতায়ত্ব আজাম দেয়া যায় না। বরং আজামের বিধি-বিধান পালনের অবাধ
স্বাধীনতাই ইসলামী খিলাফতের মূল লক্ষ্য। আর্থাৎ বসী গোষ্ঠি কিছু
সুযোগ-সুবিধা দিলেও তাতে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই। উপরন্তু এতে
মুসলমানদের জন্য কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই ডেকে আনে বেশী। ইকবাল
এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

ملا کو اجازت ملی مہ جل میں
لہاز بڑھنے کی

الافق سحرنا مے کہ
یہ دین کی ازادی

ইমাম সাহেব মসজিদে পান
নামায পড়ার অনুমতি,
মুখেরা ভাবে দীনের আঘাদী
এতেই বাগবাগ অতি।

মুসলিম যিহাদেতর এ উদ্বোধনক অবজ্ঞার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন
আরও হাদরগ্রাহীভাবে নিম্নোক্ত কবিতায় :

ہا کہ مے زور میں الجاد سے
دل خوگر میں
امتی باعث رسوائی
بوجہ ہر میں

বাহ তোদের শক্তিহীন আর
নাস্তিকতায় প্রাণ উত্তলা
নবীরও যে লজ্জা আপে
তোদেরে উশ্মতী বলা।

এভাবে আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির আত্মসচে-
তনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর উদাত্ত আহবানের ধ্বনি বিগের
মুক্তিকামী জনতার প্রাণে সাতা আগিয়েছে।

ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে ইকবাল মানব-চরিত্র
গঠনের স্বপ্নি ছিলেন। আতিসত্তার আদর্শিক দিকটি বিশেষভাবে পুনর্গ-
ঠনে ছিলেন তিনি আপোষহীন। ইকবালের দৃষ্টিতে 'ইনসানে কামিল'
হচ্ছেন মুহাম্মদুর রসূলুজ্জাহ্ (সঃ)। নিম্নোক্ত কবিতা-গঞ্জিগলোতে তিনি
ইনসানে কামিলের চরিত্র চিত্রণ করেছেন :

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ، ومن کا ہاتھ
غالب و کار انورین کا کشاکش ساز
خاک کی و نیروی نهاد بندہ ، مولا صفات
ہر دو جہاں غنی اسکی دل بے نیاز
اسکی ابدن قابل اسکی مقاصد جہاں

মুখিনের হাত যেন আল্লাহর হাত
তিনি বিজয়ী, চারিত্রিক মাধুর্য্যায় রয়েছে তাঁর সুখ্যাতি,
তিনি সাহসী, সুদক্ষ নির্মাতা ও সৃষ্টিধর্মী,
মানুষ হয়েও ফিরিশতা চরিত্রের অধিকারী
মহান প্রভুর গুণে গুণান্বিত।

উভয় অংগের লালসা থেকে তাঁর হৃদয় মুক্ত
তাঁর সাধ আশা স্বল্প, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য উচ্চ।

অন্যতঃ তিনি লিখেছেন :

‘এই নায়েব—ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানুষ) শুধু আল্লাহর প্রকৃত
খলীফা নন, বরং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ
জ্বানীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি, তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ
শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনিই এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক
এবং তাঁর রাজ্যই দুনিয়ার আল্লাহর রাজ্য। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর
গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, জ্ঞান-শক্তির অধিকারী এই
এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহর দুনিয়ার আল্লাহর রাজত্ব
কায়ম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।’

ইকবালের লেখনীতে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত জাতির প্রাণে স্পন্দন জেগেছে।
মোলায়ীর শৃংখলে আবদ্ধ জাতির ঘোর অমানিশা দূরীভূত করে উষ্মার
আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দিয়েছে। পশ্চাত্য দর্শনের অসারতা ও ইসলামী
দর্শনের কার্যকারিতা প্রমাণের মত দুর্গাহ কাজে ইকবাল সার্থক অবদান
রেখেছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগের আলোকে একটি সমৃদ্ধজনী জাতি গঠনের
চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

ইসলামের যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত জাম্বোর উপস্থাপনার প্রয়োজনে আল্লামা ইকবাল ইসলামের কালজয়ী জীবন-দর্শনের রূপরেখা নির্মিত অবয়বে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেন। তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য দর্শনের চাকচিক্য স্থান হয়ে পড়ে। ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ নতুনভাবে তার বৈশিষ্ট্যের বোঝার সোচ্চার হয়—ভাগ্যাহত জাতির জীবনে এক যুগান্তকারী নবজাগরণের সূচনা হয়।

বিংশ শতকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলিম মিল্লাতের জীবন-প্রবাহে যে উদ্দীপনা ও প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, তার গোড়ায় রয়েছে ইকবালের কাব্য-সংস্কার। মৃত্যুজয়ী গান গেয়ে তিনি সমাজের স্তরে স্তরে যৌবনের জলন্তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাণীতে ছিল আশা-উদ্দীপনার দীপ্তি, সুরে তাঁর দীপকের সংস্কার।

রসূল (সঃ)-এর উপদেশকে হাসান—অনুপম আদর্শের অনুসরণের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবানে সাড়া জ্বলছে মুসলিম জাহানের সর্বত্র তথা সারা বিশ্বে। মানবতার মূল্যবোধ সজীবিত হয়েছে তার মননগীর্ণ সাহিত্য সাধনায়, তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে জ্বর দিয়েছে এক বিপ্লবী নব জাগরণের। দীপ্ত চেতনায় জেগে ওঠেছে ধারের উত্তর—সর্বশ্রেষ্ঠ কওমের মুক্তি-পাণ্ডল সজানরা।

‘খুদী’র জাগরণের আহ্বান ছিল তাঁর কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপর্যস্ত মানবতার সংকট মুক্তির প্রত্যঙ্গে তাঁর কাব্য দর্শনে রয়েছে উন্নততর জীবন বোধের সন্ধান। তিনি জাতির কাছে নিবেদন করেছেন :

‘খুদী’র জোরেই মুসলমানের

ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ,

‘খুদী’ই যদি যায় হারিয়ে

তাহলে সে অন্যের দাস।

আজকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আমরা ইকবালের কাছে চির ঋণী। বিশ্ব মুসলিমের সংহতি, পুনর্জাগরণ এবং নব উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা প্রমাতীত। আসন্ন নব জাগরণ ও তাওহীদের উত্থান তিনি পৃথিবী অস্তিত্বটি দিয়ে অবলোকন করে ঘোষণা করেছেন :

شب گوزاں ہو گئی آخر
جاوے خورشید سے
بہ چمن معمور ہوگا
لغۃ توحید سے

উষার আলোয় রাঙলো আকাশ
তিমির কুহেলী রজনী যার,
এবার চমকে তাওহীদি গান
সংকুত হবে ভোরের বায়।

যুগে যুগে অনেক প্রখ্যাত মনীষী ও বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা অধঃপতিত জাতিকে সত্য-ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বাধা সেধেছিল কায়মী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি। তারা এসব মনীষীর উপর চালিয়েছিল অত্যাচারের স্তীম-রোলার—অকথ্য নির্যাতন ও অপবাদের প্রচারণা। তবুও তাঁদের মিশন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। আল্লামা ইকবালও তাঁর সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে মিল্লাতের নব জাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন :

چاں کہ اس بابل تنها کی واسے دل ہوں
جاگنے والے اسی ہانگہ در اسے دل ہوں
یعنی بھر زندہ نشے عہد وفا سے دل ہوں
بھر اسی بادۂ دیراندہ کے واسے دل ہوں
عجب خم ہے تو کیا مئے تو حجازی ہے مری
لغۃ ہندی ہے تو کیا لئے تو حجازی ہے مری

বুলবুলির কুহতানে হয়তো
হৃদয় আবার দীর্ঘ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পখিক
জাগবে আবার ঘণ্টারবে।
ওফাদাতীর অনুরাগে
প্রাণটি আবার উঠবে জেগে,

পূব-সুরা পান করতে
 মনটি আবার ব্যস্ত হবে।
 আজম দেনী পার হলেও
 সুরা আমার আরব দেনী,
 গান যদিও হিন্দী আমার
 সুরাটি সেই হেজাজ দেনী।

আজকের বিশ্বের প্রায় সোত্তা ন' কোটি মুসলমান তাওহীদের জীবনবাহনে
 উদ্দীষ্ট। আল্লামা ইকবাল এই আগরনের ধারাকে পতীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে
 উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অনাগত বনী আদমের উদ্দেশ্যে
 আলোক পথের দিশা দিয়ে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর এই অবিচ্ছিন্নতার
 অবদানের জন্য তিনি যুগ-যুগ ধরে তাওহীদি অনন্তর হাসরে বেঁচে থাক-
 বেন। জাতিও তাঁর কাছে চিরস্থায়ী থাকবে।

ইকবালের আবির্ভাব : ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের এক কৃতি সন্তান। বিভাগ-পূর্ব ভারতে তাঁর আবির্ভাব ও প্রিয়োদান। বিংশ শতকের ইসলামী নবজাগরণের তিনি সিংহাসনার এবং কাব্য ও দর্শনের জগতে ছিলেন পূর্বসূরীদের চিন্তা-চাঞ্চল্যের সার্থক রূপকায়। ইসলামের শাস্ত আদর্শ জাতির কাছে উপহাস-সম্মান ক্ষেত্রে তিনি যে সুনিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিলো যুগের দাবী ও অতীতের প্রেরণা সজ্জিত। তিনি নিজেই বলেছেন :

সামনে রাখতা হৌ উস্ দণ্ডের নশাত আফসা কো মীর
দেখতা হৌ দণ্ডক কি আয়নে মে ফরদা কো মীর

বিশ্বজোড়া খ্যাতি তরা অতীত আমার সামনে রাখি
পতকালের আসিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।

যনীষী আল-ফারাবী বলেছেন :

‘ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর জাতির জ্ঞান মূর্খতার রূপান্ত-
রিত হয়।’

ইকবালের জীবন ও কর্ম আলোচনার আগে স্বাভাবিকভাবেই উপ-মহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রেক্ষাপট এবং মুসলিম উম্মাহর পথ পরিষ্কারের উপর আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। এতে ইকবালের আবির্ভাব-পূর্ব ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

এক

আরব সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী ভারত উপমহাদেশ ও পশ্চিম উপ-কূলবর্তী আরব দেশের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সম্পর্ক বিদ্যমান। আরব বণিকরা বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইসলামী পঞ্চম শতকে মহানবী (সঃ)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে যে অনুগম বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, তার তুরস্যাভিধাত বিগ্রহাঙ্গী হুজিরে পড়ে। অল্প-কালের মধ্যেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আলোকপট ভারত বর্ষেও এসে পৌঁছে।

খিলাফতে রাশেদার মুখে আরব বণিকরা ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। ৬২৬ খৃঃ একটি আরব জাহাজ একদল বণিক-মুবাঞ্জিগ নিয়ে ওমান উপসাগর থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূল তানাহ্-এ এসে পৌঁছে। বণিক-মুবাঞ্জিগরা পার্শ্ববর্তী এলাকা মালাবার ও সিন্ধুতে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের সহযোগিতায় রসুল্লাহ (সঃ)-এর বেশ কয়েকজন সাহাবাও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। কথিত আছে—হযরত আদম (আঃ) বেহেণত থেকে বহিষ্কৃত হলে তাঁকে জ্বারতবর্ষের সিংহলে রাখা হয়। তাঁর পদচিহ্ন দর্শন লাভের জন্য সুদূর আরব দেশ থেকে কৌতূহলী মুসলমানরা সিংহলে আসতেন। আর এভাবে আরবীয়দের সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

কালিকটের হিন্দু রাজা 'জামোরিন' জনসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবাসী ইসলামের শাস্ত আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ কলেমা তাওহী-দের ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। এ সব নব বার'আতপ্রাপ্ত মুসলিমরা নাবিকের চাকরি গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চড়িয়ে পড়ে। ডঃ এ. এম. হুসাইন লিখেন : 'মালাবারের শেষ হিন্দুরাজা চেরা-মান পেরুমল স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মালাবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।' ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, কয়েক দশকের মধ্যেই মালাবারে ১১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের এই বাণক প্রসা-রের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে টমাস আরনল্ড লিখেছেন : ইসলামের সুমহান আদর্শ ও উদার নীতি, ইসলাম প্রচারকদের সহজ-সরল জীবন ধাপন পদ্ধতি, নিখাতিত জনগণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং লুফী দরবেশদের মানব-প্রীতি ও সেবা বর্ণ প্রখ্যাত জর্জ'রিত ভারতীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। ফলে দলে দলে নোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দ্বিতীয় অষ্টম শতকের শুরুতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে সর্ব-প্রথম একটি সুসংবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর অভিযান উপমহাদেশে প্রেরিত হয়। এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তাঁর নেতৃত্বে সিন্ধু-বিজয়ের (৭১১ খৃঃ) পর সিন্ধু ও মূলতানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম ছোট চক্রান্তের শিকার হয়ে আকস্মিকভাবে অপসারিত হন এবং শাহাদত বরণ করেন। তবুও তাঁর সোরা তিন বছরের শাসনামলে মসলমানরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক

অর্থোডক্স অধ্যায়ের সূচনা করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও সুগম হয়।

সিদ্ধু বিজয়ের আড়াই শত বছর পর তুর্কী মুসলমানরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নেন। তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনির আমীরুল উমরা সবুজগীন (৯৭৭-৯৯৭ খৃঃ) ভারতবর্ষে পর পর দু'বার সমরাভিযান পরিচালনা করে হামদান ও গেদোরার পর্বত তুর্কী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে সমরাভিযানের মতন পথ প্রদর্শক।

ইসাদী ১০০০-১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ তাঁর রাজত্বকালের ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষ অভিযান চালিয়েছিলেন। এতে ভারত বর্ষে মুসলিমদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটে। ইসাদী দাদশ ও চন্দোদশ শতকে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার কার্যে বহু সংখ্যক সুফী-বরবেশ-মুজাহিদ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—রাজা মঈনুদ্দীন চিগতী (রঃ) শেখ জ্বালাল উদ্দীন তাবরিষী (রঃ), ফরীদ উদ্দীন গজ শকর (রঃ), নিজাম উদ্দীন (প্রকৃত নাম মুহাম্মদ) আউলিয়া (রঃ), বাবা আদম শহীদ (রঃ) ও শাহজালাল (রঃ) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গজনি বংশের পতনের (৯৬২-১১৮৬ খৃঃ) পর ঘোরী রাজবংশ (১১৮৬-১২০৬), মামলুক বংশ (১২০৬-১২৯০ খৃঃ), খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪৯৩ খৃঃ), সৈয়দ বংশ (১৪৯৪-১৪৫৯ খৃঃ), লোদী বংশ (১৪৫৯-১৫২৬ খৃঃ), ভারতবর্ষে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এর পর দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে। শুরু হয় মোগল শাসনামলের।

১৫২৬ খৃঃ সম্রাট জাহির উদ্দীন বাবর ইবরাহীম লোদীর সাথে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ জয়ী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনামল। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরাট প্রভাব বিস্তার হয়। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পে তারা চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

মোগল বাদশাহ আকবর ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধনের জন্য অভিনব প্রয়াস চালিয়েছেন। 'দীন-ই ইলাহী' নামে তিনি এক নতুন তথাকথিত 'ধর্ম' পেশ করেছিলেন। এটা ছিল ইসলামের মূল কুঠারাবাত স্বরূপ। ইসলামী বুদ্ধিজীবী তথা আগ্নেয়রা আকবরের এই দীন

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। দেশ বরেন্দ্র আলিখ, সিংহ-পুত্রর শেষ আহমদ সরহিন্দী (১৪) এই ঘোর দুদিনে এ নব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পড়ে তোলেন। সরল গ্রাম মুসলমানদেরকে বিগ্রাতির কবল থেকে মুক্ত রাখার প্রচাপে তিনি জোরদার আন্দোলন পড়ে তোলেন। আন্দোলনের কারণে তিনি কারাবরণ ও অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন। ইসলামী আদর্শ ও মূলবোধকে সমুদ্রত রাখার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বস্তুত এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী আন্দোলন।

শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৪) রাজা-বাদশাহদের ইসলাম-বিরুদ্ধ কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা করতেন। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর এ অবদানের জন্য তিনি মুহাম্মদ-ই-আলেকসান্দ্রী বা দ্বিতীয় মহম্মদ বর্ষের সংস্কারক-এর মর্যাদা লাভ করেছেন।

সম্রাট মহীউদ্দীন আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর ভারতবর্ষের শাসনকার্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী। আহম-গীর-জিন্দগীর নামে খ্যাত ছিলেন। বিশ্ব-মুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি উপমহাদেশের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সুসম্পর্ক পড়ে তোলেন। মক্কা, পারস্য, বুখারা, বজখ, আবিসিনিয়ার সুলতান এবং বসরা, ইয়েমেনের শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণের আহ্বান জানান।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ—শিরক-বিদ-অত্যাচার ব্যবসার মূলোৎপাটন করেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ করেন। রসুলে করীম (সঃ)-এর প্রতি কুটুজির দায়ে হুসাইন মালিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের নির্ভর-যোগ্য গ্রন্থ ‘ফতোরায়ে আলমগিরী’ রচিত হয়।

১৭০৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর ভারত বর্ষের জোরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শোচনীয় অবসান তেকে আনে। তাঁর জীবদ্দশায়ও মারাঠা শক্তি মোপল সাম্রাজ্যের আতংক ছিল। এসের প্রতিহত করতে তাঁকে বেশীর ভাগ সময়ই লাগু থাকতে হয়েছে। মারাঠা নেতা শিবাজী ও শজুজী তাদের বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের বেশ কিছু এলাকা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অন্যদিকে সম্রাটের দূর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময়

শারসা থেকে নাদির শাহের (১৭৩৮খৃঃ) আক্রমণ মোগলদের শেষ শক্তির উপর চরম আঘাত হানে শর্ব্বদস্ত করে দেয়। হাথার-হাথার মুসলমান এতে লহীপ হন।

দিল্লীর শাহী দরবারে আমীর উমরাদের-আযকলহ, হুজুর ও কুম-তার ঘন্ডের সুযোগে বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মারাঠা-রাজ ও ইংরেজ কোম্পানীর ক্রীড়পক্ষে পরিণত হয়ে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা নাম মাঃ শাসন পরিচালনা করতে থাকে। অনাদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতার ফলে প্রদেশগুলো স্বাধীন রাজ্যে রূপ নেয়। ১৭৬০ সালে মারাঠারা দিল্লী অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে।

এ সংকটময় মুহূর্তে বিপ্লবী সংস্কারক, চিন্তান্বক ও শতাব্দীর মুক্তির দিশারী, বাঙ্গা-লেখক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) (১৭০০-১৭৬৩) আবির্ভূত হন। মুসলিম উল্লাহর এ শোচনীয় পতনের বেদনা-দায়ক পরিস্থিতিতে তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলমানদের নিপুণ শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটে। মক্কা ও মদীনা সফর করে তিনি বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রেরণা লাভ করেন। ১৭৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি হুজুর উপলক্ষে মক্কার অবস্থান করেন এবং স্বদেশে সংস্কার বিপ্লবের দৃঢ় প্রত্যয়ে ক্রিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতকের বিপ্লবী সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) (১২৬৩-১৩২৮)-এর চিন্তাধারা-প্রভাবিত যোসা উত্তরসূরী।

তাঁর সম্পর্কে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরক লিখেন :

‘শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ) বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ধারা অনুসরণ করে ইসলামের মূলনীতিগুলোকে সুসংগতভাবে প্রকাশ করেন। এতে এক দিকে যেমন ইসলামের মূলতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে, তেমনি অপর দিকে ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিরও সুবিন্যস্ত আলোচনা রয়েছে। ১৭৫৭ সালে শলানীতে মুসলিম রাজত্বের অবসানের সূচনা থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর অবদানই মুসলিম সমাজের একমাঃ দিশারী ছিল। সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে শাহ ওয়ালী উল্লাহর ভাবধারায় উদ্ভূত হয়েই সৈয়দ আহমদ বেরকভী ও শাহ ইসমাইল দেহলভী (রঃ) মুজাহিদিন আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।’

মক্কার অবস্থানকালে একটি বিশেষ স্বপ্নের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ

করেন। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুসলিম রাজত্বের হুমকি—মারাঠা নক্তি দমনের সিদ্ধান্ত নেন। অমিত্যেত্রা আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদে আলীকে মারাঠাদের মূলোৎপাটনের জন্য অভিযান পরিচালনার আহ্বান জানান।

আহমদ শাহ আবদে আলী ১৭৩৮ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত মোট নয় বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্চমবারের আক্রমণে (১৭৫৯—৬১) মারাঠাদের সাথে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ৭১ দিন উত্তরপন্থের সৈন্য বাহিনী মুখোমুখি থাকে। ১৭৬১ সালের ৬ই জানুয়ারী মারাঠাদের আকস্মিক আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা হয়। মুসলিম বাহিনীর রমানী নক্তি ও অনন্য যুদ্ধকৌশল সম্পন্ন পেনাবাহিনী মারাঠা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। প্রায় ২ লক্ষ মারাঠা এতে নিহত হয়। আবদে আলীর এ পূর্ব্ব আক্রমণে ভারতবর্ষ মারাঠা-আগ্রাসন মুক্ত হয়। ফলে মুসলিম শাসকদের এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। ১৭৬৩ সালে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ)-এর ইংতকালে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বে অপূরণীয় ক্ষতি ও নৃনাশের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যকালে কাল মেঘের দানঘটা দেখা দেয়। ভারতের রাজনৈতিক পতিধারা অন্যদিকে মোড় নেয়।

নাদির শাহের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় মুসলমানরা এবং আহমদ শাহ আবদে আলীর আক্রমণে উৎখাত হয় মারাঠারা। ভারতবর্ষের এ দু'নক্তি-ধর জাতির বিপর্যয়ের সুযোগে দুর্ধর্ষ শিখ জাতির অভ্যুত্থান ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভ্রমতা লোলুপতার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কোম্পানী প্রাপদ যড়-যন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্তিত্বশীলতার জন্য সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ইচ্ছান বোপাতে শুরু করে। মোগল বংশের শেষ কয়েকজন বাদশাহর রাজত্বকালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের বাগিচা-কুঠি। এগুলো মূলত যড়যন্ত্রের আখড়া হিসেবে কাজ করতো।

মোগল বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লীর সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রিঃ বঙ্গের যুদ্ধে শাহ আলম ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে বন্দী হন। এ সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাৎসরিক রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে।

অন্যদিকে ১৭৫৭ পালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। স্কটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। তাদের ক্ষমতার মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকার মীর জাফরকে প্রথমেই কোম্পানীর কাছে প্রতিশ্রুত দেড় কোটি টাকার অর্ধেক পরিশোধ করতে হয় এবং একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকার সম্মতি দিতে হয়। মীর জাফর কোম্পানীর প্রাণা পুরা টাকা পরিশোধ করলে বার্ষিক দরুন দেউলিয়া হয়ে পড়ে। দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে এদেশের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়। স্বাধীন দেশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য বিস্তার শুরু করে।

মহীশূর রাজ্যের নায়ক পরায়ণ শাসক হায়দর আলী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতানও ইংরেজ চক্রান্তের শিকার হন। ১৭৯২ সালের একটি সূঁজ হায়দর আলী পরাজিত হন এবং ১৭৯৯ সালে সৈদাশিরের প্রান্তরে বীর টিপু সুলতান ইংরেজদের সাথে এক যুদ্ধে শাহাবত বরণ করেন। মহীশূর ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গভুক্ত হলো। সারা ভারতে এ ধরনের স্বাধীন রাজ্য ও ইংরেজ বিরোধী শক্তি পদানত হওয়ার পর ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যই তারা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। ক্ষমতার দর্পে শুরু হয় শাসনের নামে শোষণ, শক্তি স্থাপনের নামে দমন নীতি।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার-এর লেখনীতে এ সময়কার নিরীহ ও সর্বহারা মুসলিম রায়তবর্গের করুণ চিত্র ভেসে ওঠেছে। তিনি লিখেছেন : ‘পত্নীপুত্র বহরের মধ্যে বাংলার মুসলিম পরিবারগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুবা ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন বিশ্বাঙ্গী সমাজের নীচে চাপা পড়ে যায়।’

মুসলমানদের শৌর্চ-বীর্য সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিল। তাই গোড়া থেকেই মুসলমানরা তাদের চক্কুল ছিল। ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরণে মুসলিম-স্বার্থ দারুণ ভাবে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো।

১৮১৭ সালে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। সেখানে মুসলিম ছাত্রদের ভূতির কোন সুযোগ ছিল না।

১৮২৮ সালে নিকর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন জারী করা হয়। এর ফলে এসব সম্পদের আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্রাসা-মক্তব, খানকাহ-প্রতিম-খানা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। ইসলামী শিক্ষা বহুর চক্রান্তের পাশাপাশি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বাপক কর্মসূচী নেয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ বেনিয়াদের শাসন-শোষণ, জমিদার-মহাজনদের নির্যাতন-নিপীড়ন, আমলাদের দৌরাখা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। অন্যদিকে এই নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণী—মুসলমানরা নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়। শিরক-বিন-আত, পীর পুত্রা ও কবর পুজার দোষ ছেয়ে যায়। অধুনৈতিক অনুগ্রসরতা ও সামাজিক দূরাবস্থা তাদেরকে দ্রুত অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক আকাশে মহা দুর্ধোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছিল।

নির্যাতিত জাতি যাবতীয় গণ্ডানপদতা ও হুবিরতা কাটিয়ে সংগঠিত হতে শুরু করে। এগিয়ে এলেন সমাজ সংস্কারক বীর সেনানী হাজী শরীফত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। সামগ্রিকভাবে পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। দুর্জয় সৈমান ও তেজোদ্দীপ্ত সাহস নিয়ে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে কাঁপিয়ে পড়ে, স্বাধিকার আদায়ের পুণ্য প্রত্যয়ে শীসা-ভাঙ্গা মহা প্রাচীর গড়ে তোলে। পরাধীনতার জিঞ্জীর ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বর্জন এবং একনিষ্ঠভাবে রসূল (সঃ) প্রদর্শিত জীবন দর্শনের অনুসরণের জন্য দেশবাসীকে আহবান জানান তিনি। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসিত ভারত বর্ষকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা দেন।

১৭৯৯ সালে তিনি হজ্জ পালন করতে যান। মক্কা-মদীনায় কাটিয়ে-ছেন একাধারে বিশ বছর। সেখানে তিনি প্রধিতমণা মনীষী ও হানাকী মশহাবের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শেখ তাহির আস্ সাহাালের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। হাজী শরীফত উল্লাহ তাঁর কাছে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর মন হেরার রঙননীতে ঝলমল হয়ে ওঠে, জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে চিন্তা-চেতনা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘর বারুতুল্লাহর কাছে বসে তিনি প্রতিভা নিলেন ভারতবর্ষের অধঃপতিত মুসলমানদেরকে তাওহীদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে

গোলামীর শিকল ছিন্ন করবেন। ইসলামের ফরযিয়াত যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরুন্মূষ ও সমৃদ্ধিলাভী বাজি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবেন।

১৮১৮ সালে স্বদেশ ফিরে তিনি এক ব্যাপক-ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দেন। এ আন্দোলনের নাম ছিল ফরায়েজী আন্দোলন। তিনি অসীম ভাগ্য-তিতিকা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁতি, কল ও কৃষক-মজুর ছিল এ আন্দোলনের দুর্জয় সৈনিক। অন্যদিকে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শক্তি ছিল এর বিপক্ষে। অল্প দিনের মধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলা ও আন্দোলনের দুর্গ হিসেবে গড়ে ওঠে।

আন্দোলনের দুর্বীর গতি দেখে ইংরেজ সরকার প্রশনি সংকেত শুনতে পায়। তাদের ভবিষ্যৎ-বিপদ ঠেকাবার জন্য কূটকৌশল শুরু হলো। ১৮৩১ সালে কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে ফরায়েজী আন্দোলনের সমর্থকদের এক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এর ছুতো ধরে সত্ৰাসী তৎপরতার অভিযোগ এনে হাজী শরীয়ত উল্লাহকে গ্রেফতার করে কারাগারের অঙ্গ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। লৌহ যবনিকার অন্তরালে নির্মম নির্যাতন চালান তাঁর উপর। কিছুকাল পর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীতে এ আন্দোলনের ডান পড়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া'র উপর।

বাংলার বৃহৎ ফরায়েজী আন্দোলনের পাশাপাশি সমসাময়িক কালে আর একটি ব্যাপক আন্দোলন সূফী সাধক মুজাহিদে মিল্লাত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) (১৭৮৭-১৮৩১) এর সুযোগ্য নেতৃত্বে জিহাদী আন্দোলন। ইতিহাসে এটা 'মুজাহেদীন আন্দোলন' নামে সমধিক পরিচিত। ১৮২৬ সালে তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এ বছর ২১শে ডিসেম্বর আকরা যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ বাহিনী শিব সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে ইংরেজ-মসনদ কাঁপিয়ে তোলে। ১৮৩০ সালে সেনাপতি শের সিং-কে পরাজিত করে পেশোয়ার দখল করেন। এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড-ভিত্তিক একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বুনியাদ পত্তন করেন। এ প্রজাতন্ত্রের শাসন পদ্ধতি ছিল রসূল (সঃ) ও খলিফায়ে রাশেদার আদর্শের অনসরণে।

ইংরেজ সরকার এ নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর চরম আঘাত হানে। সুসংগঠিত মুসলিম শক্তিকে চিরতরে উৎখাত করার জন্য যড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। শিবরা ইংরেজদের সাথে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার এগিয়ে আসে। ফলে অকালে এই শিও রাষ্ট্রটির পতন ঘটে। ১৮৬৯ সালের মে মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এক রক্তাক্ত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। সৈয়দ আহমদ বেরগভী তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শাহ ইসমাইল (রাঃ) সহ বেশ কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে এ জিহাদে শাহাদত লাভ করেন।

সৈয়দ আহমদ বেরগভী (রাঃ) যখন মুজাহেদীন আন্দোলনের সূচনা করেন, বাংলাদেশে সমসাময়িক কালে সিংহ পুরুষ সৈয়দ নিসার উদ্দীন ওরফে তিতুমীর ইংরেজ বিরোধী 'মোহাবদী' আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬১ সালে তিনি হুজ্বা পালন উপলক্ষে মন্ডার অবস্থান কালে সৈয়দ আহমদ বেরগভী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুসলিম উদ্বাহর পরাধীনতার গ্লানি দূর করার জন্য উভয়ের মধ্যে ফনগ্রসু আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিতুমীর সৈয়দ আহমদ বেরগভীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। সেপেক্ষে তিনি প্রথমত হিন্দু জমিদারদের জুলুম-উৎপীড়ন থেকে নিঃস মুসলিম কৃষকদের মুক্তির লক্ষ্যে একটি বিশ্লবাত্মক আন্দোলনের জন্ম নেন। ধর্মপ্রাণ কৃষকদের দাঁড়ির উপর নির্ধারিত করে বিক্রয়ে প্রতিবাদ করে এটা প্রত্যাখ্যান করার ডাক দেন। চন্দ্রিশ পরগনা, নদীরা ও ফরিদপুরের কিসমতশে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে ইংরেজ সরকারের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাড়ে। ইতিহাসের করুণ পরিণতিতে তিতুমীরও ১৮৬৯ সালের ১৪ ই নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ার বাগের কেনার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

১৮৬৩ সালে শিঙা পদ্ধতি সংস্কার করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিঙা দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৮৬৭ সালে আদারতে ফার্মার পরিবার্ত ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে মুসলমানরা শিঙা-সংস্কার দিক থেকে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। কারণ তারা গোড়া থেকেই ইংরেজ সভ্যতা ও ইংরেজী ভাষাকে মনে গ্রাণে দণ্ডা করে আসছিল।

১৮৬৭ সালে বাউন্সাপ আইন প্রবর্তন করে মুসলমানদের মৌলিক অধিকার হর্ব করা হয়। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর প্রদত্ত জায়গীর

ওলাক্‌ক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদের সাথে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। মুসলিম আইনের স্থলে ব্রিটিশ আইন প্রবর্তন করে মুসলিম শক্তিকে একেবারে কোণঠাসা করে দেয়া হয়। মুসলমানদের দুর্দশার ভিন্ন অংকন করে ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ও এইচ. সি. ব্রাউন যে হাদিস বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন, তা এক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে করি।

‘মাঝে মাঝে মুসলমানরা ভীক্ত জাতীয়তার মনোভাব ও মূঢ় বিগ্রহে দক্ষতা প্রদর্শন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।’

[উইলিয়াম হাণ্টার : দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্‌]

হিন্দুরা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, ২৪০ জন দেশীয় আইনজীবীর মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। [এইচ. সি. ব্রাউন]

দিল্লীতে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ সাল) রাজত্ব করছেন। তিনি ছিলেন মোগল বংশের শেষ সম্রাট। ইংরেজ শাসনের ষাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণ ঘাধীনতার সূর্য চিনিয়ে আনার লক্ষ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলনের ডাক দেয়। ইংরেজ আধিপত্য নির্যূল করার লক্ষ্যে সিপাহিগণ ১৮৫৭ সালে সুসংবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের একমাত্র সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু এ আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা সুকৌশলে বাহাদুর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে বাধ্যত্ব নির্বাসন দেয়। এভাবে উপমহাদেশে প্রায় সাড়ে তিন শো বছরের মোগল শাসন আমলের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সিপাহী বিপ্লবাত্তর মুসলমানরা আরো দ্বিগুণভাবে ইংরেজ সরকারের রোযানলে পড়ে। কারণ ইতোপূর্বেও সংঘটিত সব ক’টি বিপ্লব-আন্দোলনে ব্যর্থ হলে মুসলমানরা একটি অব্যাহিত ও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত জাতির ভবিষ্যৎ বকন ও হতশারী অন্তর্লগনহুত্রে নিমজ্জিত হয়। এ সংকটকালে জাতির দিশারী হিসেবে এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) ও নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯১)।

৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবের জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করা হলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডেপুটেশন প্রেরণ করেন। তিনি

The loyal Muhamedans of India বইটি ছিল মুসলমানদের সোচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করেন এবং The Causes of Indian Mutiny বইয়ে এসব স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতিকে দায়ী করেন।

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যতীত দেশসময় উন্নতির উন্নতি সুদূর পরাহত। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে মুসলমানদের সংযোগ সাধনের জন্য পুস্তকপত্র প্রস্তুত করেন। আলীগড় একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেন। এটার নাম ছিল 'লিটারেটরি এণ্ড সাইন্সিফিক সোসাইটি।' ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্টাডেন্স সোসাইটি।' এ সংস্থার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বই অনূদিত হয়। তাঁর একান্ত স্বপ্নসাথ ছিল কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মত একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘকাল আলোকনের মাধ্যমে সেই সাধ ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৭২ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান একাডেমি ওরিয়েণ্টাল কলেজ।' কিছুকাল পর এটা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত হয়। কালক্রমে এটা উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রধান ও সর্বোচ্চ বিদ্যাকেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। এ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার যেসকল নেতৃসম্পদ অনেক মহান ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠান জন্ম দেয়।

সমসাময়িক কালের বিত্তীয় ব্যক্তি হুসেন নওয়াজ আবদুল রহিম (১৮২৮-১৮৯১)। তিনি ছিলেন মুসলিম ব্যাংকার পুনর্জাগরনের অগ্রদূত। ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের প্রথম মুসলিম সদস্য। ১৮৮৫ সালে ভূপালের নবাবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কৃষ্ণবীর ভাস্কর রেখেছেন। ভারতবর্ষের নির্যাতিত মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জাতির হীনমন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে তাঁর সুদূর প্রসারী কর্মসূচী অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেটরি সোসাইটি গঠন করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেন। এ সংগঠন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকারের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা সংক্ষিপ্ত পরিধিতে উৎসাহদেপ্ত ইসলাম

ও মুসলিম উগ্রাঙ্গর সূচনা ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস গেশ করেছি। এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো—শেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) থেকে ৫৭-এর বিলম্বে নেতৃত্ব দানকারী হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরের মরী পর্মন্ত সবাই হজ্জ পালন শেষে ফিরে এসে অনৈসলামী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁদের আন্দোলন ছিল গায়কুল্লাহর সাথে আপোষহীন। এ পর্মন্ত সব আন্দোলন মুনাফিকদের কারণে ব্যর্থ হলে মুসলমানরা সিপাহী বিপ্লবের সময় মরণ পন নিয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালান।

বিপ্লব পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল মতিফ প্রমুখ মনীষীকে আমরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতামূলক নীতির সাথে আন্দোলন পরিচালনা করতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া তখন কোন গত্যন্তরও ছিল না। এভাবে সংগ্রাম মুখর দীর্ঘ এক হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলিম জাতিকে একটি অজৈয় জাতি হিসেবে দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্মন্ত বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মুসলিম জাতি ইতিহাসের এক বিশেষ মুগ সন্নিহনে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতির ডবিস্যৎ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমোজিন হয়ে পড়েছে এক কণ্ঠারের। ১৮৭৭ সালে আলীগড় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা হয়, তা ধরে রাখা এবং জাতিকে স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জীবিত করার মহান দিশারী হিসেবে স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তস্নাত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল।

দুই

লাজাবের উত্তরে কাশ্মীর। শিউ নয়া-নাজিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন এই কাশ্মীর। ‘ভূ-স্বর্গ’ হিসাবে এটা সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সবুজ গাই-গাহানি, রঙ-বেরঙের ফুল আর সুমিষ্ট ফলে ভরপুর এ শহর। লীলাময়ী প্রকৃতি যেন এখানে মুক্ত হস্তে সৌন্দর্য ও মাধুর্য দান করেছেন।

হায় এক হাজার বছর আগে এ এলাকায় কুরআনের আলো পৌছে। আরব, ইরান ও তুর্কীজান থেকে মুসলিম বণিক ও মুবাগ্নিগরা এখানে ইসলামের আহবান নিয়ে আসেন। তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনা ও ত্যাগ তিতিকার বিনিময়ে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। তখন কাশ্মীরে হিন্দু রাজাদের রাজত্ব চলছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এটা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা।

ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলিমদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও প্রেণী বৈষম্যে জর্জরিত জনগণ হেরার রঙিনী সূমহান দ্রাক্ষের আদর্শে মুক্তি হয়ে দীনে হকের দিকে ঝুঁকি পড়েছে। এভাবে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চললো। পরবর্তীতে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের দ্বারা কাশ্মীর বিক্রিত হলে ইসলামের আরও প্রসার ঘটে।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে কাশ্মীর পাঠানদের কাছ থেকে মোগল রাজত্বের অধীনে এলো। পাঠানরা আবার মোগলদের হাত থেকে কাশ্মীর দখল করে। জনগণের সাথে পাঠানদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে জনগণ। অন্যদিকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এতে হামার-হামার লোক অনাহারে মারা যায়। এ সুযোগে শিখরা কাশ্মীর দখল করে নেয়। আবার অত্যাচার শুরু হলো। কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অশান্তির আগুন ধরলো। দেশের অধ্যাত্মরূপ আইন-শুংখলার দারুণ অবনতি ঘটলো। শান্তিপূর্ণ মানুষ দলে দলে পার্শ্ববর্তী শহরে চলে যেতে লাগলো। সেখানে গিয়ে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এর মধ্যে অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরের পাশেই সিয়ালকোট। এখানে কাশ্মীর ছেড়ে আসা পরিবারগুলোর বসবাস শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছিল এ শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা বাবসা বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। নাগরিক জীবন ছিল সুখময় এবং অধ্যাত্মরূপ ক্ষেত্রে ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর থেকে আগত সিয়ালকোটের একজন শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাঁর পরিবারসহ ইসলাম কবুল করেন। এক সুখী দরবেশের সংস্পর্শে এসে তাঁরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সিয়ালকোটের মুসলমানরা ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন অটল। আল্লাহ্‌প্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ে মুকাবিলা করতেন। তার প্রমাণ মিলে ১৮৩৯ সালে সৈয়দ আহমদ খেরলভী (রঃ)-এর জিহাদী আন্দোলনে তাঁদের সর্বাঙ্গিক অংশ গ্রহণে।

তৃতীয় অধ্যায় 'সৌভাগ্যে'র সুখোদয়

সিয়ালকোটে বাস করতেন একজন সর্বজন প্রিয় বৃদ্ধ ব্যক্তি। সরকারী চাকরি করতেন তিনি। জনগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। আলেম-বুয়ুগদের সাথে ছিল তাঁর হৃদয়তাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হর হামেশা দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহর শাণী ও রসুলের হাদীস নিজে যথাযথভাবে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন সিয়ালকোটের ইসলাম গ্রহণকারী সেই অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরসূরী। তাঁর নাম শেখ নূর মুহাম্মদ।

পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে শেখ নূর মুহাম্মদ সিয়ালকোটের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন তিনি। সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ মিথ্যাকথিত জনগণের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করতো। অনায়াস-জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর পরিবারটি এলাকার মধ্যে 'শেখ পরিবার' হিসেবে বেশ সুপরিচিত ছিল। পারিবারিক উপাধি ছিল 'সগর'।

একদিন গভীর রাতে শেখ নূর মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেন—একটি ধবধবে সাদা কবুতর মনের আনন্দে আকাশে ওড়ছে। কবুতরটি দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছে আগে কবুতরটি পাক্কার। হাত বাড়ালেন এটা ধরার উদ্দেশ্যে। তা এতো উপরে যে, হাতে নাগাল পাক্কা যায় না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কবুতরটি নীচে নেমে এসেছে। একেবারে মাথার উপর। একটু পরে তিনি দেখলেন, তাঁর কোম জুড়ে বসে পড়েছে। কবুতরটি পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা।

সকাল বেলা তিনি স্বপ্ন বিশারদের কাছে গেলেন। খুলে বললেন তাঁর কাছে গতরাতেই ঘটনা। স্বপ্ন বিশারদ বর্ণনা শুনে খীর স্বরভাবে

বললেন, 'শেখ সাহেব। অদূর ভবিষ্যতে আপনি এক ভাগ্যবান সন্তানের পিতা হতে যাবেন।'

শেখ নূর হুদায়েদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে আজাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। ঘরে ফিরে তাঁর স্ত্রী ইমাম বিবিকেও এ সুসংবাদ জানালেন। তিনিও এটা শুনে আনন্দিত হলেন।

দিন যায় আর আসে। পিতামাতা গভীর আগ্রহে চেয়ে আছেন সেই সোনালী দিনের প্রতি—যেদিন তাঁরা লাভ করবেন একটি নয়নমণি সোনার চাঁদ। রাতের মুসাফির যেননি সুবেহে সাদিকের আশায় থাকে অপেক্ষমান ঠিক তেমনি তাঁরাও প্রতীক্ষায় রইলেন কখন আসবে সেই শিশু মেহমান—আজাহর অগার দান। ইতিমধ্যে তাঁরা ঠিক করে কেলছেন নবজাতকের নাম। তার নাম হবে 'ইকবাল' মানে—সৌভাগ্য।'

স্মরণীয় দিন

১২৮৯ হিজরীর ২৪শে ফিলহজ্জ মুতাবিক ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ ইংরেজী (মতান্তরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) রোজ শুক্রবার একটি স্মরণীয় দিন। দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষিত শিশু আগমন করলো ধরার বুকে।^১ মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীর মাঝে মহাশুশীর সাদা পড়লো। সবার মুখে একই দোহা—'আজাহর এ ছেলেকে দীর্ঘজীবী করুন।'

নয়নের দুলাল ইকবাল মা বাপের আশার আলো—সোনার ধন। তাঁরা শুধু চান, বড় হয়ে এ ছেলে ইসলামের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করুক। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জল করুক। কুটুমুটে তাঁদের মতো সুন্দর চেহারার ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁদের আত্মরিক দোহা ও উবিসাং চিন্তা-ভাবনার অস্ত নেই।

১. ইকবালের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পাজাব ইউনি-ভার্সিটির প্রফেসর তাহের ফারুকী 'সীরাতে ইকবাল', বহু ভাষাবিদ-পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মহাকবি ইকবাল', অধুনালুপ্ত ইকবাল সোসাইটি, ঢাকা-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান সম্পাদিত 'ইকবাল : দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে ইকবালের জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ সালকে কবির জন্ম দিবস স্থির করেছেন। ৯ই নভেম্বর পাকিস্তানে সরকারী ছুটির দিন। এদিনটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে 'ইকবাল ডে' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

ইকবাল একদিন সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ করবে কল্পমগতর। দেশ ও জাতির সুনাম বয়ে আনবে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম। সমগ্র বিশ্বের জানী-ডনীরা প্রজ্ঞাতর সম্মরণ করবে তাঁকে—এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছে।

বংশ পরিচয় ও পেশা

শেখ নূর মুহাম্মদ প্রথম জীবনে সরকারী চাকরীতে ছিলেন। মোটা অংকের মাইনে পেতেন তিনি। তাঁর সংসার জীবন ছিল অত্যন্ত সুখী। যপূর ব্যাখ্যার শুভ সংবাদ শুনে তাঁর মন-মানসিকতা হঠাৎ প্যাংকট গেল—না, সরকারী চাকরীতে হালান রুজীর সন্দেহ আছে। আর সন্দেহভূত রুজী-রোযগারে জীবন-যাপন করলে শুবিষাত বংশধরতা ও এর থেকে মুক্ত হতে পারে না। পরাধীন হিসেবে চোখ বুঁজে সরকারের গোলামী করে যাবে, স্বাধীনভাবে কোন কিছু করতে পারবেই না। উপরন্তু হারাম মিশ্রিত রোজগারে পেট পুরবে। অবশেষে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ধরলেন বাবসা বাপিজোর পথ।

মা ইমাম বিবি ছিলেন উচ্চবংশীয়া শিক্ষিতা মহিলা। সাংসারিক জীবনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, বুদ্ধিমতী ও স্নেহবরতী। তিনি ছিলেন ইকবালের দিগদর্শন। ইকবাল তাঁর মাকের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

তোমারই চেষ্টায় আমি
আকাশের তারকা পেয়েছি।
আমার জীবনতিহাসে
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে,
তোমার স্নেহমাখা নাম
থাকবে চির অশ্লান।

চতুর্থ অধ্যায় বাল্য জীবন

পরম আদর-মহলে লালিত-পালিত হতে লাগলো শিশু ইকবাল। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। শান্ত-শিল্পী ও কোমল স্বভাব ছেলেটির। মা-বাপ শিক্ষা দিতে লাগলেন আন্তে আন্তে—স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে। মাস পেরিয়ে বহর। এভাবে বয়স যখন পাঁচ বছর হলো, আব্বা-আম্মা আদর ময় করে মস্তবে পাঠাতে শুরু করলেন। উৎসাহ দিতে লাগলেন ছেলেকে পড়ার দিকে। মস্তবে ইকবালের লেখাপড়া, কথাবার্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ী স্বভাব উভাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

একদিন সকাল বেলা। শেখ নূর মুহাম্মদ নিত্য দিনের মতো ফজর নামায পেরে কুরআন তিলাওত করলেন। অতঃপর ইকবালকে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন। ছেলেকে তিনি ঈমান-কলমে ইত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ইকবালকে লজ্জা করে বললেন, বাবা। যদি তুমি বড় হয়ে কুরআনের খেদমত করতে পারো তাহলে দীর্ঘায়ু লাভ কর। আর যদি তানা পারো, তাহলে এখনই মরে যাওয়া ভালো।' পিতার এই আশা কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

ইকবালের বুদ্ধি ও মেধা খুব দ্রুত মস্তবের উত্তাদজীর সুনজর লাভ করে। প্রতিদিন তিনি খোঁজ নেন ইকবালের পড়াশুনার। পরম স্নেহ করতেন তিনি। ইকবাল এতে পেতো দারুণ উৎসাহ। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে মধুর সম্বর্ক ছিল সবার সাথে। তাই ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে আদর করতো—ভালোবাসতো। রোজ সকালে মস্তবে পৌঁছার ক্ষেত্রে ইকবালের সুনাম ছিল—দেরী হতো না মোটেও।

একদিন সকাল বেলা। মস্তবের ক্লাস যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল। সেদিন মস্তবে ইকবালের পৌঁছতে পৌঁছতে দেরী হলো। উত্তাদজী ক্লাসের ছাত্রদের দিকে নজর করে দেখেন, ইকবাল অনুপস্থিত। উদ্বেগ হস্তে পড়লেন তিনি। ভাবছেন কত কিছু। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ইকবাল

এসে হাথির। উদ্ভাদজী কাছে ডাকলেন ইকবালকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা বাবা! আজকে তোমার এতো দেৱী হলো কেন? অসুখ হয়নি তো।

ইকবাল সুন্দরভাবে জবাব দিল। বললো—‘ইকবাল দেৱ হে আতা হায়।’ —ইকবাল (সৌভাগ্য) দেৱীতেই আসে। জর্বাঁব শুনে উদ্ভাদজী অবাক হয়ে সেলেন। সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর জবাব। তিনি বুঝতে পারলেন, এ বেলে একদিন তানী-ভণীদেরকে অবাক করে দেবে। ইকবালের বহুস তখন আট-দশ বছর মাত্র।

মক্তবে ইকবাল কুরতান শরীফ হাড়া ও উপুঁও ইংরেজী পড়তো। তখন-কার যুগে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মক্তবেই পড়ানো হতো। ইকবাল সবগুলো ক্লাসে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করে এবং ১৮৮৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। শেখ নূর মুহাম্মদের বাল্য বন্ধু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা মীর হাসানও ইকবালের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। শেখ সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কারণ তিনি প্রথম দিকে ইতস্তত কর-ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা নেবেন কিনা। মাওলানা সাহেব বললেন, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেহা বলে ইংরেজী কেন অন্যান্য ভাষায় ও শিক্ষা দিলে ইসলামের শিক্ষা প্রসারের জন্য বেশ সুফল দেবে। এতে আশঙ্ক হয়ে ১৮৮৮ সালে একই মিনন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন।

ডিক্কুর প্রতি আচরণ

একদিন ইকবাল গড়ার ঘরে বসে অধ্যয়ন করতেন। গড়ীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া হচ্ছে। বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এমন সময় একজন ডিক্কুর একেবারে বাড়ীর ভেতরের গেইটে প্রবেশ করলো। মাগো! এ গরীবকে যা পারেন সাহায্য করেন। মাগো...চ্ছিধের ছালায় আর বাঁচি না। এভাবে ডিক্কারীটি ইকবালকে বিরক্ত করে তুললো। কানের উপর হাঁক-ডাক আর কতো সহ্য করা যায়। একবার-দু'বার মাত্র করার জন্য বসলেন। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা, কথায় মোটেও কান দেয় না। শুধু বলেই থাকে—মাগো...। ইকবাল এবার চটে গেলেন। আন্ত করে এক টুকরা ইট হাতে নিয়ে সজোরে ডিক্কুরের দিকে মারলেন। এতে ডিক্কুর আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ডিক্কার খেলেটি মাটিতে পড়ে লত-ভুত হয়ে গেল। ডিক্কুরের হাঁট-মাঁট চীৎকার শুনে

অন্ধর মহল থেকে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ ছুটে এলেন। এসে দেখেন ডিঙ্কু-কের গোচনীয় অবস্থা। তিনি তাকে তুলে এনে ঘরে বসালেন। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ইকবালকে বললেন, কিয়ামতের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতগণ সনাত্ত হবেন, সেখানে গায়ী, শহীদ, জানী-সাধক, আবেদ, হাফেজ সবাই উপস্থিত থাকবেন। আর তখন এঁদের সামনে রসূল (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করবেন—আমি একজন মুসলিম সন্তান তোমাকে দান করেছি, তাকে তুমি মানুষ করতে পারলে না! তখন আমি কী জবাব দেবো? ডিঙ্কুর সাথে তোমার এ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্মান্তিত ও লজ্জিত। এ সময় শেখ নূর মুহাম্মদের দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইকবাল লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। অপরাধের জন্য গভীর-ভাবে অনুতপ্ত হলেন। অবশেষে শেখ নূর মুহাম্মদ ডিঙ্কুকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। সেদিন থেকে ইকবাল আর দ্বিতীয়বার এ ধরনের কোন অপরাধ করেনি।

পড়াশুনার জন্য উপদেশ

শেখ নূর মুহাম্মদ প্রায় সমস্তই লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে পড়ার ঘরের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ছেলের পড়াশুনার স্বাভাবিক রাখতেন। একদিন সকাল বেলা কুরআন অধ্যয়নকালে তিনি ছেলেকে বললেন, 'বাবা! তুমি এভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে যাতে তোমার এটা মনে হয় যে, যেন তোমার উপর কুরআন নাথিল হচ্ছে।' লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পিতা ইকবালের হাত ধরে ওয়াদা করালেন, 'বড় হয়ে তুমি কুরআনের উপর গবেষণা করবে এবং এর শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে।' বস্তুতঃ গড়ে ইকবাল তাঁর এ ওয়াদা আজীবন যথাযথভাবে পালন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষাজীবন

১৮২১ সাল। ইকবাল সিয়াল কোটের এস্কট মিশন হাইস্কুল থেকে অস্টম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'মেডেল' লাভ করেন। পুরস্কার লাভের সূচনা এখান থেকেই। আখা-আশা, আখীর-ব্রজনের জুনিতে আর তাঁই নেই। তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হলো ইকবালের কৃতিত্বে। সবাই-সবাই ভবিষ্যত উন্নতির জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

১৮২৩ সালে ইকবাল মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণদস্ত ও ফলারশীপ লাভ করেন। ১৮২৪ সালে ভর্তি হন সিয়াল-কোটের এস্কট মিশন কলেজে। মাওলানা মীর হাসান এ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮২৬ সালে ইকবাল কৃতিত্বের সাথে এফ. আই. (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আল্লামা শেখ নূর মুহাম্মদ মাওলানা মীর হাসানের সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে বি. এ. পড়ার জন্য লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। দিচ্কা-দীচ্কার দিক থেকে এ কলেজের বেশ সুনাম রয়েছে। লেখা-পড়ার পরিবেশ ছিল বেশ উন্নত। প্রতি বছর বহুসংখ্যক ছাত্র এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।

ইকবাল লাহোর গিয়ে দৃষ্টিভ্রাণ্ড ও জুনি দু'টোই হলেন। দৃষ্টিভ্রা এজন্য যে, আখীর-ব্রজন ও মাওলানা মীর হাসানের বিশ্লেষণ এবং জুনি এজন্য যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে যে সব খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের নাম শুনে আসছিলেন, লাহোরে এসে তাঁদের সাক্ষাত পেলে। আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালী, মীর্যা আরশাদ গোরগানী প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইকবাল যে সব কবি-সাহিত্যিকদের পরম সান্নিধ্য লাভ করতেন, তখন কি কেউ জানতেন যে, এই তরুণই একদিন বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে।

মাওলানা মীর হাসান : অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান ছিলেন লাহোরের একজন ব্রাহ্মণ ও বরেনা আলিম। আরবী ও ফার্সী ভাষার ছিল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। সিয়ানকোটের চোট বড় সবার কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। লাহোর এসকচ মিশন কলেজে তিনি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। সে যুগে আলিম সমাজে তাঁর মতো সর্ববিষয়ে পারদর্শী বিদ্বান ব্যক্তি বিরল ছিল। তিনি ছিলেন আলিম সমাজের গিরোমনি, বিদ্যার সাগর।

শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে ভয়ে অড়সড় হয়ে থাকতো। কেমনা প্রথমদিকে তিনি যেভাবে হুকুমতি শাসন করতেন তাতে অনেকেই হিনসিম খেয়ে যেত, কথার কথার শাসাতেন খুব। এটা ছিল তাঁর শিক্ষা-দানের টেকনিক। যে হার প্রাথমিক পরীক্ষার ধৈর্য সহকারে এসব সহ্য করতো, পরবর্তীতে তিনি তার জন্য জানের দুয়ার খুলে দিতেন। অন্তরঙ্গভাবে মাসামমতার হায়াতলে আশ্রয় দিতেন। ফলে প্রকৃত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্ররা তাঁর সাধিধা লাভ করতে সক্ষম হতো। ইকবাল ছিলেন এদেরই একজন। এ মহান মাওলানার কাছে অমূল্য শিক্ষা লাভ করে ইকবাল ধনী হলেন।

ইকবালের পিতা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে দেখা করতেন। আগাপ-আলোচনা করতেন। একদিন মাওলানা বললেন, আপনার হেলেক মস্তবের শিক্ষা দারা তুস্ত করা যাবে না। বিববিদ্যানয়েই পড়াতে হবে তুকে। ইকবাল তাঁর কাছে এক, আই, পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। আরবী, ফার্সী, ইসলামিহাত ও হিকমত প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন।

ইকবাল মাওলানার পবিত্র সাহচর্যে গিয়ে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সুফী দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। এতে তাঁর জীবনে গেনার সোহাগায় মিলন হয়েছে। 'পারসা ভাষায় কুরআন' নামে খ্যাত মগনভী শরীফের ভাষ্যকার ছিলেন মাওলানা মীর হাসান। ইকবালকে নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগনভীর আলোচনা করতেন। তাই প্রাভাবিকভাবে আমরা ইকবালকে রানী (৩ঃ)-এর দার্শনিক ভাবধারায় উদ্ভাবিত একজন মরমী কবি হিসেবে দেখি। বস্তুতঃ সুফী মতবাদের প্রতি আকর্ষণ ইকবালের ছোট বেল থেকেই অন্তরে সূত্র ছিল। মীর হাসানের সাহচর্যে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে আল্লামা রানীর কাব্যিক ভাবা-দর্শের চাপ পরিমল্লিত হয়।

ইকবাল বলেছেন :

মরা বিগর কি দর হিন্দুস্তা নমী বীনা
ব্রাহ্মন রমম্ আশনায়ে কাম ও তাবরীম আন্ত

‘আমার প্রতি লক্ষ্য কর। কেননা আমাকে ভারত দেখবে না।
এক ব্রাহ্মণ সন্তান মাওলানা রামী ও শাবসউদ্দীন তাবরীযীর (কাব্যের)
রহস্যবিদ হয়েছি।’

‘ইলতিজা-ই-মুসাফির’ কবিতায় ইকবাল সেই পরম প্রজ্ঞাভাজন উত্তাপ
মীর হাসানের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : তিনি আমার কাছে আলী
মুর্তযা (রাঃ)-এর জ্ঞানের ভারের মত। তিনি চিরদিন আমার কাছে
পবিত্র কা’বার ন্যায় সঙ্গানিত থাকবেন। তিনি আমার কল্যাণ কামনা
করেছেন। তাঁর মহত্ব আমাকে জানী করেছে।

ইকবালের ভাষায় :

‘উওহ্ শমা’ এ বারগাহে খান্দানে মূর্তযাভী
রহেগা মিস্লে হেরম জিস্কা আন্তা মুজকো।
নফস্ সে জিস্কে খোজী মেরী আরয্ কী কলী,
বনায়া জিস্কা মরওতনে নুকতানী মুজকো।
দোয়া ইয়েহ্ কর কি খোদাওন্দে আসমানো মমী’
করে ফের উস্কা মিয়াবত সে শাদ মী মুজকো।’

‘প্রদীপ্ত আগোর শিখা

খান্দানে আলী মূর্তযার ;

কা’বার সঙ্গান হেন

তাঁর ঘর কাছেতে আমার।

আমার হৃদয়-কলি

প্রস্ফুটিত যোহার নিঃখাসে,

যাঁর দানে তত্ত্ববিদ

আমার এ জীবনে বিকাশে।

আসমান-স্বমীনের

প্রভু ওগো মানিক সবার,

সুখী করো, এই দোয়া

আরবার দর্শনে তাঁহার।’

১৮৯৩ সালে লাহোরের এক জনাকীর্ণ সাহিত্য সভায় ইকবাল জীবনের সর্বপ্রথম মঞ্চদ্বারা বা কবিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতার রচনা-শৈলী শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দেয়। এতে অল্পদিনের মধ্যে ইকবাল সুনামটি হক্কিরে পড়ে।

১৮৯৭ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ইকবাল আরবী ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা নিয়ে প্রথম বিভাগে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এ বছরই তিনি জামা'ত উদ্দিন পরক্কার লাভ করেন। পুরস্কারের খবর সারা দেশময় হক্কিরে পড়ে। এতে তিনি দেশবাসীর চরপ্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

টমাস আরনল্ড : ইকবালের অনন্য শিক্ষক

দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ইকবালের গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৯৮ সালে তিনি উক্ত কলেজের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। এখানেও তিনি আর একজন ছাত্রজামা শিক্ষকের সঙ্গিনে পেলেন, যিনি দর্শন শাস্ত্র ছাড়াও ইসলাম ও আরবী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত ছিল। তিনি হলেন প্রফেসর টমাস আরনল্ড (পরে স্যার)। তিনি একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ ছিলেন। বৃটিশ সরকারের সরাসরি নিয়োগ-পত্র নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন।

টমাস আরনল্ডের সাহচর্য এসে ইকবাল মাওলানা মীর হাসানের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করলেন। তাঁর সান্নিধ্যে ইকবালের জ্ঞানের রাজ্য পুণ্ডিত প্রসারিত হতে লাগলো। টমাস ইকবালকে পেয়ে অশেষ খুশী হলেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পত্র-ঘণ্টা, দিনের পর দিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন সিক দিয়ে আলাপচলা হতো। এসব উচ্চাঙ্গের আলোচনা ইকবালের জন্য ছিল ব্রহ্মত্বের মাত্র। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর টমাসকে ইকবালের অমূল্য শিক্ষদাতা বলা চলে। তিনি বলতেন, 'এ ছাত্রই শিক্ষককে (জামাকে) অধিকতর জানী করে তুলেছে।'

ইকবাল প্রায় দু'বছর তাঁর স্নেহছায়ায় শিক্ষা লাভ করে ১৮৯৯ সালে প্রথম বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন এবং কৃতিত্বের সমুদ্রতরঙ্গ সর্বস্বত্ব লাভ করেন।

অধ্যাপনা

এ বছরই তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ আরবী বিভাগে সাময়িকভাবে প্রভাসক পদে নিয়োগ লাভ করেন। মাত্র তিন বছর সেখানে অধ্যা-

পনা করার পর লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর টমাস আরনল্ড লন্ডন চলে যান। সেখানে তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ইকবাল তাঁর শিষ্য উপলক্ষে ‘নালায়ে ফিরাক’—‘বিশ্বদেবর আন্তনাদ’ কবিতাটি প্রজ্ঞাজনী হিসেবে পেশ করেন। কবিতাটি মাসিক মাখ্যানে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইকবাল ছাত্রদেরকে সে কোন বিষয়ে অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করার পর আরবী বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ছাত্ররা তাঁর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনায় পরম তৃপ্ত হতো। তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান ও গবেষণা যে কোন বিষয় সহজবোধ্য করে দিত। ফলে কিছুকালের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের পরম আস্থাভাজন শিক্ষক হয়ে যান।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায়

ইকবাল তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘নালায়ে ইয়াতীম’—‘ইয়াতীমের আন্তনাদ’ কবিতাটি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায় সর্বপ্রথম আবৃত্তি করেন। এ কবিতাটি শ্রোতাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। শ্রোতারা ইকবালের আবৃত্তির সাথে সাথে মুহম্মদ তাকবীর ধ্বনিত আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। কবিতাটির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের অর্থানুকূল্যে দুই লক্ষ কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় ইকবাল মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার বিগদ বর্ণনা দিয়ে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা ‘হিমালাহ’ ও ‘হিন্দুস্তা হামারা’ প্রভৃতি আঞ্জুমানের সভায় আবৃত্তি হয়েছিল। সর্বসাধারণের কাছে তাঁর এ কবিতাসমূহও বিপুল সমাদর লাভ করে। কবির হৃদয় নিঃড়ানো আকৃতি সবার প্রাণে স্পন্দন জাগায়।

এক সভায় আল্লামা আলতাফ হোসাইন আলী, ডঃ নজীর আহমদ, মীর্যা রাশেদ গারগানী, মির্জা মুহাম্মদ শফী, স্যার আবদুল কাদের, স্যার ফজলে হোসাইন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, খাজা হাসান নিজামী প্রমুখ মনীষী উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে আল্লামা হাজী তাঁকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। তখন হাযার-হাযার লোকের মুহম্মদ তাকবীর ধ্বনিত সভাঙ্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

কিছুদিন পরের কথা। এক সভায় আল্লামা হালীর কবিতা আবৃত্তির কথা ছিল। লাহোরের সর্বত্র প্রচারিত হলো এ খবর। খবর পেয়ে হামার-হামার উত্ত-অনুরক্ত হুটে এল। বাধ্যকোর কারণে আল্লামা হালীর তখন পূর্বের সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর নেই। আওয়াম এতই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, পাশে বসেও তাঁর বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হতো। তবুও উক্তদের একান্ত অনুরোধে তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে হলো। এটা যেন তাঁর অস্তিম আবৃত্তি। কিছুক্ষণ আবৃত্তি করার পর তিনি অপরগ হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর স্যার আবদুল কাদের সাহেব মাইকে ঘোষণা করলেন—তাঁর অবশিষ্ট কবিতাটুকু তরুণ কবি ইকবাল আবৃত্তি করে শুनावেন। তখন প্রোক্তারা তাকবীর খনি দিয়ে সভা স্থল মুখরিত করে তোলে।

এবার ইকবাল হালীর কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চার মাইনের একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। এটা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। তা ছিল এই :

شہور زمانہ میں ہے نام حالی - معورے حق ہے جام حالی
اس کشور و شمر کا نبی ہوں گوہا - 'زل ہے' رہے لب سے کلام حالی

'আল্লামা হালী এ যুগের একজন বিখ্যাত বাজিত্ত। তাঁর পাশ (কবিতা) সত্যে সমৃদ্ধ। আমি একজন কিশোর, নবীর মতো (নবীরা যেমনি আল্লাহর ওহী নিয়ে কথা বলেন তেমনি) আমার কণ্ঠ থেকে কবি হালীর কথাই বেরাচ্ছে।'

'মলকুদ্দাতে ইকবাল' গ্রন্থে আল্লামা শেখ আবদুল কাদের লিখেছেন, 'আল্লামানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ইকবাল মর্মস্পর্শী সুরে 'শেকওয়া' পাঠ করলেন। উপস্থিত হামার-হামার শ্রোতাকে তিনি আবেগময়ী কবিতা দ্বারা মুগ্ধ করে ফেললেন। তখন চারদিক থেকে লোকেরা অজ্ঞত যুগ বর্মণ করতে লাগলো।

ইকবালের বয়সান পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ এ কবিতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছেলের এ কৃতিত্ব দেখে তাঁর দু'নয়নে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। খুশিতে তিনি আহুদারা হয়ে পড়েন।

বিষয়তঃ বেঁচে যাওয়া কারণী ছিলেন : এক মন্ত্রণাসের ঘটনা। ইকবাল তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি কণ্ঠ কবিতা পাঠ করতেন। কবিতার নাম ছিল ‘সরবারে রিসালত মৌ’—‘নদীর সরবারে আরম্ভ’। ‘দেখা গেল, প্রোটা-সফটক দৃবুল হাকদীর ধনির মাধ্যমে আনন্দে মুগ্ধিত হয়ে উঠলো। হাজার শাবী জামে মস্তিষ্কের বিশাল প্রাক্তন জনসমূহের এ ধনিতে প্রকল্পিত হয়ে ওঠলো।

পবনশীতে কাগজেরে যে কোন টপকামী জনসার ইকবাল ছিলেন প্রধান আকরক—নামমি। সনে সনে ভক্তরা তাঁর কবিতা শোনাও জনা ছুটে আসতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ইউরোপে

পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী

কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর জ্ঞান-সাধক ইকবালের মন ব্যাকুল হতে উঠলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন—যে কোন ভাষার বিনিময়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে হবে। ১৯০৫ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের চাকুরী ইস্তফা দিয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানী গেলেন। উক্ত শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে তাঁর জাই ইঞ্জিনিয়ার অস্টা মুহাম্মদ সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি দিল্লীর নিজাম উদ্দীন আলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন। জার্মানীতে পৌঁছে তিনি মিউনিক ইউনিভার্সিটির অধীনে উচ্চতর দর্শন শাস্ত্রের গবেষণার নিয়োজিত হন।

মজার ব্যাপার। দীর্ঘদিন পর পরম অক্লেশে শিক্ষক স্যার টমাস আর-নফের সাক্ষাৎ হলেন। ইকবাল তাঁর পরামর্শক্রমে ‘পারসীক মরমীবাদ’ নামে একটি অবনত গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৭ সালে জার্মানীর মিউনিক ইউনিভার্সিটি তাঁর Development of Metaphysics in Persia থিসিসের জন্য P. H. D. ডিগ্রী প্রদান করে। এটা তাঁর অন্য বিরাট ভাগ্য ও মুসলিম বিশ্বের জন্য গৌরবের ব্যাপার ছিল। তাঁর উক্ত থিসিসটি লণ্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশনী ১৯০৮ সালে প্রকাশ করে। এছাড়াও পরবর্তীতে উক্ত থিসিসটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষায়ও এটি অনূদিত হয়েছে।

আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী

উইবের্ট ডিগ্রী লাভের পর ইকবালের মনে আরেকটি নতুন সাধ জাগলো। বলতে গেলে এটাই ছিল তাঁর অধ্যয়নের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এবারও স্যার টমাস আর্নল্ডের পরামর্শক্রমে লণ্ডনের লিঙ্কনস্ ইন-এ এসে আইন শাস্ত্রের উচ্চতর অধ্যয়নের নিমিত্ত উত্তীর্ণ হলেন। দেখা গেল জীবনের সর্বশেষ পরী-

কায়ও তিনি অশান্ত ক্রিয়ার সাথে উড়ীষ হয়ে ১৯০৮ সালে 'বার-এট-ন' (লণ্ডন) ডিগ্রী লাভ করেন।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা

১৯০৭ সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের পর জানতে পারলেন—লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, ইকবালের অন্যতম শিষ্যক স্যার টমাস আরনল্ড বিশেষ প্রচেষ্টায় এক বছরের ছুটিতে যান্ধেন। তিনি ইকবালকে তাঁর অনুপস্থিতি কালীন সময়ে তাঁর স্থলে অধ্যাপনা করার জন্য অনুরোধ জানানেন। স্যার টমাস ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে যোগ্য হাছ ইকবালকে তাঁর স্বস্বাভিষিক্ত করে গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা অনুসারে ইকবাল ১৯০৭—১৯০৮ সাল পর্যন্ত এক বছরের জন্য উক্ত ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে বার-এট-ন ডিগ্রী লাভ করার পর ব্যারিস্টারী করার উদ্দেশ্যে বসেশ ফিরে আসেন। লণ্ডন থেকে ফেরার পথে আলীগড়ে এসে সংস্কৃত ভাষা শেখেন।

সপেক্ষ ফেরার পর তিনি আইন ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ সালে লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসারে যোগ দেন। তাহাড়াও লাহোর লর্ডনমেন্ট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

জার্মানী ও লণ্ডনে

উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মানী ও লণ্ডনে অবস্থান কালে ইকবাল সেখানকার লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও গবেষক মহলে সুপরিচিতি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সবার আপনজন হয়ে উঠেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমায় সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সবার সাথে আন্তরিকতা ও বদ্ধত্বপূর্ণ পরিবেশ ইকবালের প্রবাস জীবন অশান্ত সুখে কাটে। তাই দূর বিদেশের নিঃসঙ্গতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

জার্মানী পৌঁছে ইকবাল ক্যান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'মুসলিম তমুদ্দুনের মর্মকথা' প্রভৃতি বিষয়ে চয়টি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো এতো জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বমূলক ছিল যে, শত-শত ইংরেজ বুদ্ধি-জীবীর মনে তা গভীর রেখাপাত করে। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রথমত ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করেন এবং তাওহীদ, রিসালত ও ইবাদতের গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

এসব বক্তৃতায় তিনি বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতিকে একটি সত্যের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তৃতার সারাংশগুলো জার্মানীর জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক-গুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হয়।

ডঃ আর. এ. নিকলসন

লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি বিপুলভাবে সমাদৃত হন। অনেক ডানী-গুণী ও শিক্ষাবিদেদের সাথে তাঁর আশাতীত বক্তৃত্ব ও অধ্বনসত্য সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ বিখ্যাত মনীষী ডঃ আর. এ. নিকলসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইকবালের গুণ মাধুর্যে অভিভূত হয়ে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। লন্ডন থেকে স্বদেশ ফেরার সময় নিকলসন ইকবালকে পুনরায় লন্ডন আসার জন্য উদ্বাদা করান। পরবর্তীকালে ইকবাল লন্ডনে ‘গোল টেবিল’ বৈঠকে যোগদান করতে গেলে ডঃ নিকলসনের সাথে পুনর্বার মৌজ্য-সাক্ষাত করেন।

ডঃ নিকলসন ‘আসরারে খুদী’ বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইকবালের প্রতি সম্মান জানান এবং উভয়ের মধ্যে বক্তৃত্বের চির যোগসূত্র স্থাপন করেন। এ দু’জন মনীষী আজীবন একে অপরকে স্মরণ রেখেছিলেন। ডঃ নিকলসনের ইংরেজী অনুবাদটি ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি পাঠকমহলে আশাতীত সমাদর লাভ করে এবং ইকবালের কাব্যপ্রতিভা পাশ্চাত্যের ডানী-গুণীদের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায় কাব্য-চর্চা ও শীকৃতি

১৮৮৬ সালে গোরাবন্দার (দেবালকোটের কবিহানুটানে) অংশ গ্রহণের পর থেকে ইকবালের মন ধ্যানমগ্নতা কাব্য-চর্চার দিকে ক্রমশঃ পড়ে এবং তাঁর মস্ত বিকাশ লাভ করতে থাকে। তিনি রীতিমত কাব্য-চর্চা করতে লাগলেন।

একদিন ছাত্ররাবালের ঊন কবি দানের কাণ্ডে কতগুলো কবিতা ও পদ্য সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। কবি দান এগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন। তারপর রোটি একটি মতবা লিখে পাঠালেন—‘এ কবিতাগুলো সংগ্রহ করার কোন অবকাশ রাখে না—এগুলো কবিত্ব স্বাধীনতার সার্থক, সুন্দর ও জনবান্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিয়ে।’ এ মতবা লেখে ইকবাল খুসিতে আঁটখানা। অনামধ্য কবির মতবা তাঁর উপসাহ আরো বিভিন্ন বেড়ে গেল। তিনি আরো গভীরভাবে কাব্য চর্চার মনোনিবেশ করলেন।

তাঁর কবিতার গুণিত্যের লসারতা ছিল। স্বদেশ প্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি সমর্থন, ইসলামের পবিত্র আদর্শে তাত্ত্বিক বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠার যত্ন, জাতির উত্থান-পতন, দলীর কলহ ও অশান্তির মিরসন প্রতিটি বিষয় কবিতার ছান পেতো। সমস্ত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী পুরে আহবান জানাতেন জাতিহীন ভাবে। স্বকীয় আদর্শের সম্মানে যুব সমাজকে উত্তেজিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

ইকবালের কবিতা প্রিয়জন আনন্দন ও আবেগ রয়েছে বলেই অত্যন্ত সময়ে তিনি বিস্তৃত খ্যাতি লাভ করেছেন। জাতি-ধর্ম নিষিদ্ধে তিনি সবার যে সম্মান পেয়েছেন—তা ইতিহাসে বিরল। মহাপুরুষ বিখ্যাতগণের দর্শন শাস্ত্রের একজন হিশু অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—‘মুসলমানগণ ইকবালকে লক্ষ্য করে তাদের সম্পদ খোঁজ দাবী করতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা গোষ্ঠী-বিবেচনায় সম্পদ নন—তিনি একান্তভাবে আত্মপ্রেমী।’

১৯০১ সাল। এপ্রিলের এক শুভ সকাল। তৎকালীন সবপ্রতি উর্দু পত্রিকা 'মাখযান'-এর বিশেষস্থানে তাঁর 'হিমাকাহ' কবিতা প্রকাশিত হয়। ইকবাল তা দেখে অশেষ খুশী হন। এতে তাঁর উৎসাহ উত্তেজিত বেড়ে যায়।

আল্লামা শিবলী মু'ম্বানী, আলতাফ হুসাইন হানসি, জাকব্ব্ব আলফা-বাদী প্রমুখ খ্যাতিমান কবির পথ অনুসরণ করেই ইকবাল কবিতা ও গল্প রচনা করেন। সহজ ভাবে বলতে গেলে—তাদের হস্তচুম্বিত অর্পণতাকে ইকবাল পরিপূর্ণতা দান করেন।

মুসলমানদের দত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ও ইকবাল যেন কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ব্রিটনের প্রবর্তিত বর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের তাওহীদ, ঈমান, আকীনা ও ইসলামী ন্যায়ের বহু-খেলাফ। তাই তিনি এ বাপারে সুদূরপ্রসারী পরীক্ষণ করেন। আল্লামার রহমতে তিনি এতেও সাক্ষর্য অর্জন করেন। তাঁর রচিত পুস্তক 'আল-ইজমুল ইকতেসাদ' উর্দু ভাষায় অর্থনীতির উন্নত রহস্য পুস্তক। এটি ১৯০৩ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

তাঁর পড়ার ঘরে রাশি-রাশি বই পুস্তক এখানে দেখানে হুজুর-ছিটানো থাকতো। চাকর এতলো গুহিষে রাখতে লাইতে তিনি বাধা দিতেন এবং বলতেন—বইগুলো এগোমেলা থাকলেই এক সময়ে অনেকগুলো বই দেখতে পাই। আর গুহিষে রাখলে বই কোথের জাকুল হয়ে যাবে। তখন আমার মন অস্থির হয়ে ওঠবে।

একদিনের ঘটনা। পড়ার রাতে ইকবাল কবিতা লিখছেন। তাহেরের ভূমিকম্প চলছে। চারদিকে ধ্বংসের ভাঙবলীনা। ঘর বাড়ী ভেঙে চূর-মার হয়ে যেতে লাগলো। ইকবালের সেদিকে মোড়ও প্রত্যক্ষ নেই। তিনি শুধু লিখেই যাচ্ছেন। বাইরে কি ঘটছে, সে সম্পর্কে কে-কবর। চাকর আজী বখশ পাগলের ন্যায় ছুটোছুটি করছে। আর চীৎকার করছে, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! ইকবাল এতক্ষণে টের পেলেন। আজীকে বলতেন—ছুটোছুটি করো না। বরং সিঁড়ির উপর নীরবে দাঁড়িয়ে থাক। এতটুকুই বলে তিনি আবার লেখার কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আর হর রহমত! সেদিনের ভূমিকম্পে চারদিকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলোও তাঁর আশ-পাশ কোন ক্ষতি হয়নি।

আল্লামা ইকবাল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর অমর কাব্য আমাদেরকে ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক নেতার চাইতে ইসলামী ভাবধারায় কালজয়ী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কবি হিসেবে বেশী পরিচিত করে। মুসলিম উম্মাহর একজন যুগের নকীব ও সফল সংস্কারক ইকবালের কাব্যের চিরন্তন ও শাস্ত্র আহ্বান চিন্তামূলক মানুষের চিত্ত স্পর্শ করবেই।

তাঁর সুদীর্ঘ কালের কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. ছাত্র-জীবন থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জাতির উদ্যান পতনের কারণ নির্ণয় ও জাতিভেদের অবসান কামনা।

দুই. ১৯০৫-১৯০৮ সাল পর্যন্ত দেশাত্মবোধ, ধর্ম ও মুসলিম বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

তিন. ১৯০৮-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইসলামের দর্শন ও শাস্ত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার আহ্বান।

কর্মজীবনে সত্যতার দৃষ্টান্ত

১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর থেকে তিনি লাহোরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। কয়েক বছর পর থেকে লাহোরে সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তাছাড়া লাহোরে পতর্নমন্ডি কলেজে (নৈশ বিভাগ) অধ্যাপনাও করেছেন।

কর্মজীবনে পদার্পণ করার পর ইকবাল কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলেতেন। এ সময় সাধারণত জ্ঞান সাধনা, গভীর রাতে সাজাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করে কাটাতেন।

সরলভাবে জীবন যাপন ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার গ্রহণ করে কোর্টে চলে যেতেন আর রাতে শুধু এক পেয়লা লবণ-চা পান করে কলেজে যেতেন।

আইন ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যাযনিষ্ঠ। অনায়ে-অসত্য আমলাত। তিনি গ্রহণ করতেনই না, উপরন্তু মজলুমের পক্ষে তাঁর সর্ব-শক্তি নিয়োগ করতেন। আইনের মারপ্যাঁচে জালিমকে কখনও সাহায্য-সহযোগিতার প্রশ্নই পড়তেন না। কারণ তিনি এটা দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করতেন—মানুষের বিন্দু মাত্র অন্যায়ের জন্য রাক্বুল আলামীনের দরবারে

জবাবদিহি করতে হবে। জীবনে কোন প্রয়োজনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। পরিমিত ব্যয়ে চণার উপযোগী টাকা পেলে তিনি নতুন মামলাই গ্রহণ করতেন না।

১৯২৬ সালে বিখ্যাত ডুমরাও রাজ মালগার বাংলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দু'মাসের জন্য পাটনায় আসেন। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের সামনে অর্থ-বিশেষত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা দান করা। তাঁর দৈনিক সন্ধানী ছিল এক হামার টাকা—দু'মাসে ষাট হামার টাকা। ডঃ ইকবাল এসেই মামলার সমুদয় কাগজপত্র দেখলেন। মাত্র দু'দিনের খসড়ায় তাঁর মতামত পেশ করে আদালতে দাখিল করলেন এবং লাহোর চলে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিনের খুলত মামলা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইকবাল ইচ্ছে করে অযথা বিলম্ব না করে তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ করে দিলেন। গড়িমসি করে বিলম্ব করলে তাঁরই লাভ হতো। কারণ দৈনিক হামার টাকা সন্ধানী সে সময়ে ছিল বিরাট ব্যাপার। টাকার প্রতি যে তাঁর লোভ ছিল না, এটা তার প্রমাণ। অসহায় গরীব লোকের মামলা তিনি বিনা পয়সায় করে দিতেন।

ডক্টর অব লিটারেচর, ডি, লিট, স্যার উপাধি ও সম্বর্ধনা সভা

কবি ইকবালের কাব্যের খ্যাতি বিখ্যাত ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একজন কৃতি সন্তানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সম্মান দেয়া হয়নি দেখে পাকিস্তানের সাবেক শাসনকর্তা স্যার এডওয়ার্ড মাকলাগান বিস্মিত হন। তিনি এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালে ইকবালকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। দীর্ঘ দিন পর তিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেন। তাঁর এ মৌভাগ্যের সংবাদ শুনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই খুশী হলেন।

অন্যদিকে ইকবাল স্যার উপাধি গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—'আমাকে স্যার উপাধি দিতে গেলে পূর্বাংগে আমার উস্তাদ মাওলানা শীর হাসানকে 'শামসুল উলামা' (আলেম গণের সূর্য) উপাধি দিতে হবে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁর দাবী 'নীতিগতভাবে মেনে নিলেন' এবং মথারীতি মাওলানাকে 'শামসুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করার পর ইকবাল তাঁর 'স্যার' উপাধি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও গুণের কদর সবার কাছে সমান। জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মিসর, তুরস্ক, ইরান, তুর্কীস্তান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তাঁর উক্তবন্দ লাহোরে ছুটে আসতে লাগলো। তাদের উদ্দেশ্য, শুধু প্রাপ্তপ্রিয় কবিকে অভিনন্দন জানানো এবং তাঁর দর্শন লাভ করা।

মুসলমানদের মতো শিখ ও হিন্দুরাও ইকবালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তাঁর সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ এ তিন জাতির পক্ষ থেকে লাহোরের বাসিন্দারা সাদৃশ্যের তাঁকে সম্বোধিত করে। পাজাব ও লাহোরের হাযার হাযার লোক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তা, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের প্রাপ্তপ্রিয় কবিকে সম্মান জানানোর জন্য উপস্থিত হন। ইকবাল সেখানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

ব্রিটিশ সরকার থেকে সার উপাধি পাওয়ার পর সমালোচকরা ইকবালের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করতে লাগলো। কেউ বলতে লাগলো—ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ শ্রবণ করার জন্য এটা একটা চক্রান্ত করেছে। অনেকে বলতে লাগলো, ‘অবশেষে ইকবালও কী করবে? পদনোভ ত্যাগ করা এত সহজ নয়।’ আর কেউ বলে বেড়াচ্ছে—‘সার উপাধিতে ইকবালের বিপরী চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটলো।’ ইকবাল এসব অপবাদ নীরবে শুনে শুনে সময়-সুযোগে জওয়াব দেয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁর সম্মানে পাজাবে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তেজোদীপ্ত কণ্ঠে এ ভুল ধারণার অপমোচন করলেন তিনি। উক্ত সভায় পাজাবের গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইকবাল কয়েকটি মূল্যবান কবিতা আবৃত্তি করেন, যা ‘তুলুয়ে ইসলাম’ গ্রন্থের শুরুতে সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজের দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন, ‘দুনিয়ার কোন শক্তি শত চেষ্টা করেও আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসার দমিয়ে রাখতে পারবে না।’

১৯৩৩ সালে পাজাব ইউনিভার্সিটি মহাকবি ইকবালকে ‘ডক্টর অব লিটারেচার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৬ সালে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি তাঁর জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে ১৯৩৭ সালে এনাহাবাদ ইউনিভার্সিটিও তাঁকে ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

অষ্টম অধ্যায় রাজনীতির ময়দানে

পাজাবের আইন সভায়

পাজাব তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা ছিল তখন অত্যন্ত নাজুক। তাদের সপক্ষে কথা বলার তেমন কেউ ছিল না। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা দুর্দশা কবলিত এ আশ্রিত মুক্তির জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। মুসলমানদের স্বাধিকার আদায় ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে—মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ অন্যতম। তন্মধ্যে ইকবাল ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আন্দোলনের দিক-নির্দেশক।

ইকবালের ইচ্ছে ছিল, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুটানোর জন্য আগ্রাপ চেষ্টা-সাধনা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি পাজাব আইন পরিষদে সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। ১৯২৪-১৯২৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর একনিষ্ঠভাবে দেশ ও দেশের সেবা করেন। মুসলমানদের উন্নতি ও মুক্তির জন্য তাঁর চিন্তার অস্ত ছিল না। দেশের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো। বৃটিশের গোলামীর জিজীরে আবদ্ধ মুসলিম জাতির ভাগ্যোন্নয়নই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

আইন পরিষদে সর্বদা চাষী ও মজুরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনে তিনি সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। এতে ক্ষমতাসীনদের ভিত্তি কেঁপে উঠতো। পাজাব সরকারের আয়কর ও ভূমিকর নীতির বিরুদ্ধে তিনি তৎকালীন রাজত্ব সচিব সার ফ্রাঙ্কলি হোসাইনের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশেষে ইকবালের উপস্থাপিত মুক্তি সচিব হেরে গেলেন। ইকবালের দাবী-দাওয়া মাথা পেতে মেনে নিলেন। সে সময়ে আর যাই হোক, যে কোন শাসককে ইকবালের সাথে আলোচনা করতে একটু সমীচীন করতে হতো। তাঁর মুক্তির কাছে অন্য কোন মুক্তি হার মানতে বাধ্য হতো। ইকবাল এভাবেই আজীবন মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্গর ইকবালের অন্তরকে আন্দোলিত করে-
তোলে। তিনি স্বীয় প্রজা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ
করে মুসলিম মিলাতের মুক্তির সংগ্রামে খাঁপিয়ে পড়েন।

ইকবাল অধঃপতিত দেশ ও ঘৃণিত জাতিকে জাগ্রত, উন্নত ও নতুন
কর্মোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করার সংগ্রাম সাধনার জন্য বিজাতীয় সংস্কৃতি
পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এ ছিল বৃটিশ সরকারের
জনা বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৯০০ সালে লাহোর 'আজমানে হেমায়েতে ইসলাম'-এর সভায়
'নালায়ে ইয়াতীম'—'ইয়াতীমের আর্তনাদ' শীর্ষক যে কবিতা আবৃত্তি করে-
ছিলেন, সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজকে সে কবিতা দারুণভাবে আলোড়িত
করে তোলে।

১৯১০-১৯১১ সালের ইতিহাস বিশ্বমুসলিমের জন্য কারবালার ইতিহাস।
বলকান ও ত্রিপুরার মুসলমানদের রক্তের বন্যার প্রোত ইকবালের মর্ম-
স্পর্শ করে। সেখানকার ইসলামী খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার
আশংকায় ও শোকে তিনি জ্বালাময়ী কবিতা ও গজল দিয়ে মুসলিম
বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করলেন। মুসলমানরা তাঁর কবিতা পুষল
ওনে বুকফাটা কাগজ জুড়ে পড়ে। ১৯১১ সালে ৬ই অক্টোবর তিনি
লাহোর শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে 'জনে শহীদা কী নজর' নামে যে কবিতা
আবৃত্তি করেছিলেন তা অগ্ন্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কবিতা প্রোত-
বৃন্দের কাগজ চোখ ভাসিয়ে দিল।

পরবর্তীতে উক্ত বক্তৃতাবলী সংকলিত হয়ে The Reconstruction
of Religious Thoughts in Islam নামে পুস্তকাকারে ১৯৩৯ সালে
লাহোরে প্রকাশিত হয়। বইটি সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন
সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেতেছে।
সম্প্রতি উক্ত বইটির বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডে-
শন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামে প্রকাশিত
হয়।

ইকবালের রাজনৈতিক চেতনার পেছনে কুর্তান-হাদীস, ইমাম অজ-
গাজ্জালী, আল রায়ী, মাওয়াদী, নিজামুল মুলক তুঙ্গী, ইবনে হাজম ও ইবনে
খালবুনের চিন্তাধারা দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৮ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর

প্রভৃতি বিষয়বিদ্যালয়ে কতৃপক্ষের আমন্ত্রণে পর্যায়ক্রমে বহু বক্তৃতা দেন।

বক্তৃত্তাগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

- ১। জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।
- ২। দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।
- ৩। আল্লাহ সন্থলে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম।
- ৪। মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অযয়তা।
- ৫। মুসলিম তনন্দুনের মর্মকথা।
- ৬। ইসলামী বাবস্থায় প্রতিশীততার নীতি।
- ৭। ধর্ম কি সত্য ?

সেখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী যহলে বিপুল সম্মান ও রাজকীয় অন্টার্ঘনা লাভ করেন। দূর দূরান্ত থেকে হাজার-হাজার মানুষের জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় কবিকে এক নজর দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়। এভাবে ইকবালের চিত্তাধারা দিন দিন প্রসারিত হয়ে লাগলো। জাতীয় জীবনের এ যুগ সক্রিয়ভাবে এমন একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক কবির আবির্ভাব সত্যিই আল্লাহর অপার রহস্য। কবি ইকবালের ছালায়দী কবিতায় মুসলিম মিল্লাতের মৃত ধমনী সক্রিয় হয়ে ওঠতে লাগলো।

আল-কুতুবানের ভাষায় : ‘যে জাতি নিজেরাই নিজদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহও তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।’ আল্লামা ইকবাল এ আয়াতটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি আমার জীবনের ত্রেষ্ঠ অংশ ইসলামের আইন-কানুন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী তনন্দুন, ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে ব্যয় করেছি। আমার মনে হয়—ইসলামের এসব মূল বিষয়ের সাথে আজীবন সম্পর্কের কারণে আমার জ্ঞান-ভান্ডার যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি।’

ইকবাল ইসলামকে নিষ্কল ধর্মানুষ্ঠান মনে করতেন না। বরং এটাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও যানব জাতির জন্য একমাত্র বিধান বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মানব জীবনের কোন দিকই ইসলামের দৃষ্টির বাইরে নয়। তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। ধর্মকে তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্র তথা সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

শক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর অস্বাভাবিকভাবে কেবল প্রাচ্য দেশসমূহে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের চিন্তার রাস্তা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এবার ইকবালের সাথে ব্যক্তিগত হওয়ার পদক্ষেপ শুরু হলো। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে পুনর্গঠিত হলো 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'। ভারতবর্ষে ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও ডাবাদর্শে মুসলিম স্বত্বাধীনা নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন। তাঁদের সুযোগ নেতৃত্বে চলতে লাগলো মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। নেতৃবৃন্দ একাধারে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইকবাল তাঁদেরকে পরামর্শ দিয়ে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করতেন।

মুসলমানদের মনে জাগার সঞ্চার হলো। এবার বৃষ্টি সুবোধ সাদিকের আলোর রেখা ফুটে ওঠবে। হারানো রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার হবে। বৃষ্টিশ বৈশিষ্ট্যের হাত থেকে বাঁচা যাবে। সারা ভারতে মুসলিম লীগের তৎপরতা জেরলাই ছেঁতে ওঠলো।

১৯৩০ সালে ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মুসলমানদের জন্য একটা স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করেন। মুসলিম লীগের এখন শুধু একটি মাত্র দাবী, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন মূল্যবোধের পাত্রবে এবং দেশ পরিচালনা করতে পারবে। এ বছর এলাহাবাদে 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আল্লামা ইকবালের সভাপতির ডায়েরি ছিল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে ইকবাল সার্বজনিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বহুত ইকবাল না থাকলে পাকিস্তান আন্দোলন এতখানি সফলতা লাভ করতো না। ইকবাল ছিলেন রাজনীতির দার্শনিক আর অনার্য ছিলেন শুধু রাজনৈতিক। তাই বলতে হয়, পাকিস্তান আন্দোলন ইকবালের কাছে একান্তভাবে স্বর্গী। কিন্তু আল্লাহর মহী এ মহামহনীয় উক্ত আন্দোলন সফল হওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। তাঁর ইন্তেকালে আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ২৪ আগস্ট মুসলিম লীগের আন্দোলন সফল হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি অভিযোগের জবাব

ইকবালের বিরুদ্ধবাদীরা হিপ্রাশেষমণে তৎপর ছিল। তাঁর ইসলামী আগরণমূলক কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে তারা তুণ হিলো না। এরা চাইতো ইকবালও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়ান। তারা কটাক্ষ করে বলতো, ইকবাল তো (গোফতারে গাম্বী) কথার উত্পাদ, (কিরদারে গাম্বী নেহী) কাজের উত্পাদ নন। এভাবে তারা তাঁর চরিত্রে কালিয়া লেপন করে যাচ্ছিল।

একদিন মাওলানা মুহাম্মদ আলী এ ব্যাপারে ইকবালকে প্রশ্ন করলে তিনি রসিকতার সুরে জবাব দিলেন :

মায় তু কাওয়াল হোঁ, মায় গাতা হোঁ তোম্ নাচতে হোঁ, কিয়া তোম চাহতে হোঁ কেহ্ মায় ভী তোমারে সাথ নাচনা শুরু কর দোঁ।

(আসারে ইকবাল : পৃঃ ২৮)

—আমি তো গায়ক, আমি গান পাই আর তোমরা সুরের তালে তালে নাচ। এখন তোমরা কি চাও যে, আমিও তোমাদের সাথে নাচি ?

এর অর্থ হলো, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতা নিয়ে জন্মে। সবার জন্য একই কাজ উপযোগী নয়। ইকবাল সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, তোমরাও তোমাদের দায়িত্ব পালন কর।

নবম অধ্যায় পারিবারিক জীবন

সাদাসিধে জীবন

আজামা ইকবাল অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তাঁর মনে বিদ্যা-বুদ্ধির বিন্দুমাত্রও অহংকার বলতে ছিল না। তাঁর জীবনে ছিল অসংখ্য পুণের সমাহার। এসব গুণরাজি তাঁকে মহীয়ান ও পরীক্ষান করে তুলেছে। সারা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর শান-শওকত ও আড়ম্বর থাকতে পারতো, কিন্তু তিনি ছিলেন এর বিপরীত।

তাঁর বন্ধু-বান্ধব, অনুরক্তরা প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি সহস্রা বদনে সবার সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করতেন। সর্বদা তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যেত। দূর-দূরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী ও ভক্তদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে তিনি মোটেও ক্লান্তি বোধ করতেন না। এদের জন্য তাঁর দরবার সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো।

ফুলের সৌরভের মতো ইকবালের চারিত্রিক মাধুর্য মানুষকে মুগ্ধ করে দিত। মুরকবীকে সন্ধান ও ছোটদেরকে সৌহ করা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাকে তিনি দারুণভাবে ঘৃণা করতেন। আর সত্যকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

স্যার আবদুল কাদের বলেন, আজামা ইকবাল এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সাথে কেউ সাক্ষাত করলে তিনি বুঝতে পারতেন তাকে কিভাবে বুঝাতে হবে। নিজে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকা ও অপরকে হাস্যোজ্জ্বল রাখাই ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ।

ব্যারিস্টার মীর্যা আলল উদ্দীন লিখেছেন : পৈদনন্দিন জীবনে ইকবাল আমাদেরকে সাদাসিধে জীবন যাপনের শিক্ষা দিতেন। রসুল (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। তাঁর যত্নে

একজন আদর্শ মু'মিন, চিন্তাবিদ, ও শিক্ষাবিদ বর্তমান শতাব্দীতে বিরল।'

মাওলানা সাইয়েদ জাবুল আলা মওদুদী লিখেছেন :

“একবার পাজাবের এক ধনী লোক আইনগত পরামর্শের জন্য আল্লামা ইকবালকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। সাথে ছিলেন স্যার ফজলে হোসাইন ও আমরা দু'জন। রাতে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা হলো। ধনী লোকটির বিরাট প্রাসাদ আরাম-আয়েশের জায়গা। ইকবাল কাজ সেরে বেডরুমে ঘুমোতে গেলেন। আরাম-আয়েশের এত সামগ্রী দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। সুখের জন্য এরকম বিছানা পেয়ে তাঁর মনে সাথে সাথে উদিত হলো রসূল (সঃ)-এর কথা। ‘মেরসুলের বরকতে আমি এরূপ জান, মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছি, তিনি খেজুর পাতার বিছানায় শুয়েছেন’—এ খেয়াল আসতেই তাঁর চোখ পানিতে ভেসে গেল। অতঃপর সেই বিছানায় আর শু'লেন না। উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন এবং একটি চেয়ারের উপর বসে কাদতে লাগলেন। গভীর রাতে আমরা এ অবস্থা দেখে অনন্যোপায় হয়ে পড়ি। বাড়ীর চাকরকে ডেকে বললাম, সাধারণ একটি চৌকি এখানে নিয়ে এস আর বিছানা পেতে দাও।’ এভাবে গোসলখানার এক পাশে শু'য়ে তিনি রাত কাটালেন।”

‘ইকবাল-সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ অমিত্র চক্রবর্তী এক পর্যায়ে লিখেছেন :

ইকবালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর সমুখে আহৃত হবার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে একটা ঔদাসীনের বিস্তী হাওয়া মানুষকে পৌঁড়ন করে। হাঁকার নল মুখ থেকে সঙ্গিয়ে রেখে অসামান্য সন্তোহনের সহিত তিনি চৌকির উপর উঁচু হয়ে মানুষকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য কায়দায় একজন পাজাবী উদ্রলোকের পরিলক্ষ্যে অর্ধশায়িত থাকেন। তাঁর হাসি মানুষকে স্বস্তি দেয়। নিখুঁত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন।’

কুরআনের প্রতি ভালবাসা

লাহোর তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল হেকিম মুহাম্মদ হাসান কারদী লিখেছেন : কুরআনুল করীম আল্লামা ইকবালের অত্যন্তপ্রিয় বস্তু ছিল।

তিনি ছোটবেলা থেকেই মধুর সুরে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওতে অত্যন্ত ছিলেন। তিলাওতের সময় তাঁর চেহারায় নূরের আভা সৃষ্টি উঠতো। কখনও উৎফুল্ল চিত্ত অথবা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওত করতে না পারলে তিনি মনে খুবই দুঃখ পেতেন। তখন রীতিমতো তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। তিলাওতকালে গভীর মনোমোগ কুরআনের মর্মার্থের প্রতি নিবিষ্ট থাকতো। এমনকি অনেক সময় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অশ্রুতে ভিজে যেত। তিনি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে মে কুরআন শরীফখানা তিলাওত করতেন তা নাহোর ইসলামিয়া কলেজের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এটা তাঁর নীরব সাক্ষী।

ব্যারিস্টার মীর্ষা জালাল উদ্দীন লিখেছেন : ‘আল্লামা ইকবাল কুরআনের প্রতি সব সময়ই গবেষণা ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিলাওতের সময় মধুর উচ্চারণ ও অর্থের উপর ব্যাপক গবেষণা চালাতেন। নামামের সময়ও কুরআনের আয়াত বুঝে বুঝে পড়তেন। মর্মার্থ উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র ভয়ে কঁদে ফেলতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল মার ফলে তিলাওতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত। এটা ছিল তাঁর আল্লাহ্-প্রেম ও কুরআনের প্রতি গভীর ভাল-বাসার নিদর্শন। বস্তুত কুরআনের বরকতেই তিনি বিষয়জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।’

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণ করে বলেছেন : ‘তিনি যা কিছু চিন্তা করতেন সবই কুরআনের আলোকে চিন্তা করতেন। মে পদক্ষেপ নিতেন তা কুরআনের ভিত্তিতেই নিতেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর চিন্তা ও কাজের সাথে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আজীবন তিনি এই আদর্শে অবিচল ছিলেন। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন কোন উচ্চ শিক্ষিত মনীষীকে দেখিনি, যার বিষয়জনীন স্বীকৃতি প্রাপ্ত কাব্য-প্রতিভা, পি. এইচ. ডি. ও বার-এট-ল ডিগ্রী রয়েছে।’

মাতাপিতার ইন্তেকাল

আল্লামা ইকবাল লাহোর সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিস্টারী করার সময় ১৯১৪ সালের ৯ই নভেম্বর দিওয়ানকোটে তাঁর মাতা ইমাম বিবি ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক মোল বহর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে পিতা

শেষ নূর মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল এক শ' বছর। আদি বছর বয়স থেকে তিনি দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পারিবারিক তথ্য

আতা মুহাম্মদ ছিলেন ইকবালের বড় ভাই। আতা মুহাম্মদ ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইকবালের তেরো বছরের বড় ছিলেন। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি লন্ডনে বসবাস করতেন। ইকবালের উচ্চবিজ্ঞান বাণ্যারে তিনি বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। ইকবালের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তিনিও ইন্তেকাল করেন।

ইকবাল দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ঘরে একজন সন্তান ছিল। তাঁর নাম আফতাব ইকবাল। তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করার পর লন্ডনে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দু'টো সন্তান। নাম জাভিদ ইকবাল (বর্তমানে তিনি লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি) ও সুনীরা বানু। তাঁর মৃত্যুকালে জাভিদের বয়স ছিল ১৪ বছর আর সুনীরার বয়স প্রায় ১০ বছর।

দশম অধ্যায় বিদেশ সফর

আমীর নাদির খানের আমন্ত্রণ

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। আজামা ইকবাল পেশওয়ার সফর শেষে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানিস্তান পৌঁছেন। শিক্ষা সংস্কারের বাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁকে এ আমন্ত্রণ জানান। রাজধানী কাবুলে ইকবাল রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে দারুল আমানে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির জাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর রাস মসউদ, ও আজামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী। ডঃ গোলাম রসূল মিহর (বার-এট-ল) ও এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হাদী হাসান মতাক্রমে ইকবাল ও ডি. সির প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে ইকবাল এক সাক্ষাতে আমীর নাদির খানকে সন্তুষ্টি মঞ্চমল মোড়ানো এক খণ্ড কুরআনুল করীম উপহার হিসেবে পেশ করে সন্তুষ্টিতে বললেন, ‘আজাহর বাবী এ পবিত্র মহাপ্রস্থ আপনাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উপহার দিলাম। এর প্রতি লাইনে বিয়ের যাবতীয় গোপন রহস্য, জীবন সমস্যার সমাধান ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি বিদ্যমান। এ গ্রন্থই আমার একমাত্র সঙ্গল, আমি একজন ফকীর মাঠ।’

কাবুল সাহিত্য সংসদ আজামা ইকবালের সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সেরা কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। আজামা ইকবাল অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তাঁর আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

সরকারকে শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ পেশ করে ইকবাল স্বদেশে চলে আসেন। ফেরার পথে তিনি গজনি ও কাপাহার সফর করেন। গজনির প্রসিদ্ধ মাযারসমূহ ও প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে সুলতান মাহমুদ গজনি, হাকিম সিনাই (রঃ), হযরত আতাগজ বখশ (রঃ) ও তাঁর পিতার মাযার ঘিয়ারত করেন। সফরকালে তিনি খুসফির নামে ফারসী ভাষায় দু’টি কবিতা রচনা করেন।

ইকবাল লাহোর পৌছার কয়েকদিন পর পত্রিকা মারফত জানতে পারলেন যে, দুর্ভাগ্যবশত অত্যন্ত হামলায় আমীর নাদির শাহ শাহাদত বরণ করেন। (ইমা লিলাহি.....রাজেউন)। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে ইকবাল শোকে মুহাম্মান হয়ে পড়েন।

প্যারিস, ইটালী ও স্পেন ভ্রমণ

১৯৩২ সালে ইকবাল প্যারিসে নেপোলিয়ানের সমাধি পরিদর্শন ও সে দেশের প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ মেসিগনের সাথে সাক্ষাত করেন। এ বছরই তিনি ইটালী ও স্পেন সফর করেন। ইটালীতে মুসোলিনির সাথে সাক্ষাত করেন। স্পেনে সফরকালে 'দোয়া', 'মসজিদে কডোঁডা' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলো মুসলিম ভাষায় বিশেষ অবদান রেখেছে। তাঁর সফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্পেনের একটি প্রাচীন মসজিদে নামায আদায়। ক্রিস্টের যুগে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর প্রায় পাঁচ শ' বছর উক্ত মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল। এ মসজিদের করণ পরিদর্শিত সময়বে ইকবাল 'মসজিদে কডোঁডা' কবিতাটি লিখেন।

আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলনে

১৯৩১ সালের প্রথম দিকে ইকবাল ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত মু'ত্তমার-ই-আলমে আল-ইসলামী' (ইসলামী বিশ্ব সম্মেলন-এ) যোগদান করে ভারত বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বছরই ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে যোগদান করেন।

১৯৩২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। এ বৈঠকসমূহে আহুত প্রিন্স আগা খান ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য পরামর্শ দান করেন।

একাদশ অধ্যায়

যুগান্তকারী দর্শন-তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর মুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-মানবতা ও মুসলিম জীবন ধারায় মে বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বংসোদ্ভূত পরিস্থিতির সঞ্ছীন হয়েছে ইকবালের বাণী ও কাব্য এর মথাহত সমাধান দিয়েছে। ফলে মুসলিম মিল্লাতের স্বকীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে ইকবালের চাইতে প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের অল্পই জন্ম হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য ইসলামের মর্মবাণী এমন যুগোপযোগীভাবে পেশ করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীত অন্য কারও দ্বারা হয়নি। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মন-মগজ আন্তে আন্তে নানাবিধ ধান-ধারণায় উজ্জীবিত হতে লাগলো। প্লেটো, এরিস্টোটল, ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্ক্স, লেনিন, মুসলিনি, শোপেন হাওয়ার, হেগেল, মেকিয়াভেলী, হাকিংস কাণ্ট, রুশো, নীটশে, প্লাটিনাস, স্পিনোজা, শেলিং, বার্মসোঁ, ব্রাউলি প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিক, সমাজ বিজ্ঞানী চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত মতবাদে বিশ্ব ছেয়ে গেছে। মুগ জিতাসার জবাবে ইসলামের শাস্ত্রত আদর্শকে একটি অজ্ঞেয় ও ডারসাম্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে ইকবাল যে অমূল্য অবদান রেখেছেন, তার জন্য তিনি আমাদের কাছে অবিশ্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুসলিম বিশ্ব তথা এ উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রের তাঁর মতাদর্শ যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সুনিপুণ ভাবে।

মানুষ সম্পর্কে উপরিউক্ত দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি; কেউ বলেছেন, 'মানুষ নিয়তিরই পুতুল; সুতরাং তাকে যা করানো হবে, তার জন্য সে বিন্দুমাত্র দায়ী হবে না।' কেউ মানুষের যৌন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ বলেছেন, 'মানুষ ষতদিন বিধাতা বলে কাউকে বিশ্বাস করবে, ততদিন তার উন্নতির পথ রুদ্ধ।' ইত্যাকার হাজারো মতবাদ

ও পাশ্চাত্য দর্শনকে ইকবাল যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ একটি জাতি। পৃথিবীতে সে আল্লাহর খলীফা মনোনীত হয়ে এসেছে। আল্লাহ মানুষের ইচ্ছে ও কর্ম শক্তিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। সে-ই ভালমন্দ জ্ঞান ও যুক্তির কণ্ঠিপাথরে মাচাই করে নিজেই বেছে নেবে। ফলে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শিখবে। পক্ষান্তরে আখি-রাতে তার ভালমন্দের জন্য তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। তাছাড়া হৌন ও পেটের সমস্যা বড় নয়। এগুলো পশুদের প্রধান সমস্যা। মানুষের আসল সমস্যা হচ্ছে ঈমান আকীদার সমস্যা, আদর্শের সমস্যা।

ইকবাল ছিলেন খুদী বা ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত একজন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। আসরারে খুদীতে তিন কতই না সুন্দর করে লিখেছেন :

খুদী কো কর বুলন্দ এতনা কে হার তাকদীর ছে पहले
খোদা খোদ বান্দা ছে পুছে বাতা তেরী রেজা কিয়া হ্যায়।

খুদী করো প্রসারিত—

বুলন্দ এমন শক্তিমান,

(যেনো) তকদীর লেখার আগে

খোদা তাঁর বান্দারে শুধান,

তোমার সম্বন্ধি কিসে

(বলো তুমি কিসে হও খুদী ?

আমার নিয়ামত দেবো

হুড়িয়ে বিপুল রাশি রাশি।)

তাঁর মতে ভিক্ষুক আজীবন ভিক্ষা করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। বরং ভিক্ষার ফলে গরীব আরো গরীব হয়। খুদীও অপমানিত, লাঞ্চিত হয়। অতএব আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় বা বিশ্বাস হারালেই মানুষের স্বংস অনিবার্য। ধর্মকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের তথা সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। তিনি বলেন, ‘শিশির কণাকে জমিয়ে নদীতে পরিণত কর আর মোমবাতির মত নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে অনাকে আলো দাও।’

জীবন ও জগত সম্পর্কে এরকম হাযারো মতবাদকে খণ্ডন করে ইকবাল সমুচিত জবাব দিয়েছেন। তাঁর দর্শনের মূল উৎস ছিল কুরআন

ও হাদীস। তাই এক কথায় বলা যায়—ইকবাল নিছক একজন দার্শনিক, কবি, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ নন বরং তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের একজন মুখপাত্র ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

আলীগড় ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বোম্বায়ের প্রাক্তন শিক্ষা উপদেষ্টা কে. জি. সাঈয়িদাইন Iqbal's Educational Philosophy (ইকবালের শিক্ষা দর্শন) বইয়ের উপক্রমণিকায় লিখেন :

পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপূর্ব সুসংবাদ বহন করে আনবার জন্য ও নতুনতর মান স্থাপন করার জন্য এমন একজন অনন্যসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভাধর ভাবকের আবির্ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে একটা প্রাকৃতিক অবদান। তাঁর চিন্তাধারা মত বেশী করে তাঁর সমসাময়িকদের কাজনা, বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশি করে তার প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায় জীবন সায়াহ্নে

১৯২৩ সাল ইকবাল কঠিন মূত্রাশয় রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় দু'বছর দিল্লীর বিখ্যাত হেঙ্কিম নাবীনা সাহেবের চিকিৎসায় সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। রোগাক্রান্ত হওয়ার তাঁর শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্বর স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি দ্বীপ কর্মসূচী পরিত্যাগ করেন নি। সংগঠনের কার্যাদি সুচারুরূপে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দাখিল গাননে তাঁর একটুও শিথিলতা ছিল না।

রোগ মুক্তির পর পরই তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর বিয়োগ বাথায় তিনি মুহাম্মদ হয়ে পড়লেন। মানসিকভাবে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অবশেষেও চিকিৎসা রেখা ফুটে উঠলো। রোগা ক্রিষ্ট প্রৌঢ় বয়সে তাঁর যখন সেবা শুশ্রূষাগরাম্প লোকের প্রয়োজন দেখা দিল, তিক তখনি তিনি তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

১৯৩৪ সালে আবার মূত্রাশয়ের রোগ দেখা দিল। একই সাথে বাত রোগও। ফলে শারীরিকভাবে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। চলা-ফেরা করার শক্তি তো হারালেনই, সে সাথে কঠোর গুরু-গভীর উদার স্বরও হারালেন। এবার বুঝতে পারলেন, তাঁকে শীঘ্রই পরলোকে যাত্রা করতে করতে হবে। তাই ১৯৩৫ সালে সপরিবারে 'জাভিদ মনবিলে' স্থানান্তরিত হন। এখানে কিছুকাল বসবাস করার পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাভিদের মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে ইকবাল আরো কাহিল হয়ে পড়েন। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে একে একে দু'জন সহধর্মিনীর ইন্তেকালের শোক সংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইকবাল এখন থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। জ্যেষ্ঠা পুত্র আফতাব ইকবাল লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. ও বার, এট-ল ডিগ্রী লাভ করে লন্ডনেই ব্যারিস্টারী করছেন, আদালতের কাজে তিনি ব্যস্ত।

জ্যেষ্ঠা কন্যা হওয়ার ব্যতীতে। কমিউন পুত্র আখিও ইকবাল ও কন্যা মুনীরা জনৈক মহিলার হাতে লালিত-পালিত হইলেন। কবি এ সময় দুঃখ-শোক ও রোষ-যন্ত্রণার মধ্যে কালাহিনীত করছিলেন। একান্ত অনুভূত ভূত্যা আলী বরখ তাঁর সেবার নিয়োজিত।

ইকবাল এবার মৃত্যুর সুখ পান করার জন্য পূর্ণ প্রতীতি নিষ্পন্ন। অসমাপ্ত কাজ গুটিয়ে আনছেন। সময় আসন্ন বুঝতে পেরে সমস্ত সম্পত্তির উইল প্রস্তুত করে রেজিস্ট্রি অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৩৫ সালে 'ওসীয়াতনামা' লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এদিকে দিন দিন রোগ বেড়ে যেতে লাগলো। অনাঙ্গিক আয়ুষ্কাল ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে আসতে লাগলো। জীবনী শক্তি নিস্তেজ-নিশ্পত্ত হয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কথাবার্তা ও আলোচনা কানে তিনি জ্ঞান্টি অনুভব করতেন না। হাতা প্রতিদিন কবিকে দেখতে আসতেন তারা তাঁর রাজনীতি, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা শুনে কেউ বিতর্ক করতে পারতেন না যে, কবি গুরুতর রোগে আক্রান্ত এবং তিনি উদ্ভাসের লোক সাদরে তাসিয়ে চির বিদায় গ্রহণ করবেন।

মৃত্যু শয্যা

লাহোরের শ্যামনামা ডাক্তার ও হেফিমগণ পালান্বে ইকবালের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগের অবস্থা তমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডাক্তারগণ বুঝতে পারলেন—এটাই তাঁর মৃত্যু-রোগ। সুতরাং এ প্যাথি আরোপা হবার নয়। কবি আর বেশীদিন ইহল্লখতে থাকবেন না। তাঁরা কবিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানিয়ে চুড়ান্ত ফলসালার দিনের অপেক্ষায় রইলেন। প্রখ্যাত হেফিম মুহাম্মদ হাসান কারশী প্রতিদিন সজ্জা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কবির সেবা ও শ্রমায় নিয়োজিত থাকতেন। হেফিম সাহেব ছিলেন ইকবালের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম। তিনি তখন লাহোরে চিকিৎসা কলেজের প্রিন্সিপাল। তাছাড়া আরো অনেকে সাময়িকভাবে এসে খেদ-মত করতেন এবং তাঁর ভানদর্ভ আলোচনা শুনতেন।

১৯৩৭ সালে মিসরের আমেদ্যা আছহারের শিক্ষাবিদগণ লাহোরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল নেহরু মুম্বই কবিকে দেখার জন্য লাহোর আসেন। এ বছর মার্চ মাসের প্রথম দিকে কবির রোগ আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেল। সমস্ত শরীরে কুলা দেখা গিল

এবং হৃৎকিত্ত প্রসারিত হয়ে পড়ল। অবস্থা এতই মারাত্মক আকার ধারণ করলো যে, তখন বিছানা থেকে উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত হারালেন। যৎসামান্য তরল পদার্থের খাদ্যপ্রবাহ গ্রহণ হাড়া অন্য কিছু আহার বন্ধ হয়ে গেল। শুভরা যে হাদীয়া তোহ্ফা নিয়ে হাবির হস্তেন মহানুভব ইকবাল উপস্থিত লোকদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। শত চেষ্টা করে হয়তো তাঁর মুখে সামান্য আহার দেয়া হতো— অনাসক্তভাবে দায়ে ঠেকে তিনি কিছু খেতেন। আজাদী এ কী রহস্য! এ সময়ও কবির জ্ঞান-শক্তি সূচাক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল। তাঁর চিন্তাপ্রসূত আলোচনা তখনও অব্যাহত ছিল। জীবন মৃত্যুর ঐ ক্রান্তিকালের কঠিন মুহূর্তে তিনি মুখে মুখে ‘ইসলাম আওর কাওমিয়া’ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত হয়। (প্রবন্ধটি বাংলায় অনূদিত হয়ে ‘ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ’ শীর্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ‘ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র’ বইয়ে সংকলিত হয়েছে।)

৭ই মার্চ কবির একান্ত বন্ধু ও ভক্ত অধ্যাপক গোলাম রসুল মিহর ও আবদুল আযীম তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁরা কবিকে চিত্তামুগ্ধ করার জন্য বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আপনি অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করবেন।’ তাঁদের কথা শেষ হতেই কবি বলে উঠলেন, ‘মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, বরং সানন্দে অত্যাধীন জানাযো।’

হিজ্রাহ সফরের আশা

আজাদী ইকবালের মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল, হিজ্রাহ সফর করবেন। হিজ্রাহ বলতে বিশেষ করে মক্কা-মদীনাকে বুঝায়। আজাদী যত্নের তাওফিক এবং বিয়ারত ও মদীনা মুনাব্বিয়ার রওবা মুবারক বিস্তারিত করার বাসনা ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের। কবি তাঁর কবিতায় সেই জন্য হিজ্রাহকে কোন ক্রমে ভুলতে পারেননি। হিজ্রাহ সফরের জন্য তিনি বহুবার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন অসুবিধার কারণে যেতে পারেননি। হজ্জে যাওয়ার নিয়তেই তিনি ‘আরমুগানে হিজাহ’ ‘হিজামের উপহার’ নামক কাব্য-গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে কিছু কিছু স্থান বাদ রেখেছেন হজ্জে গেলে সম্পূর্ণ করার আশায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর এই অন্তিম বাসনা পূর্ণ হলো না।

ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে উপস্থিত ভক্তদেরকে তিনি জানাজেন,

‘সাহরানপুর থেকে আমার একজন বন্ধু চিঠি লিখেছেন যে, তিনি এবার হচ্ছে গিয়েছিলেন। বয়তুলাহ শরীফ তাওয়াফকালে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ আমাকেও হচ্ছে মাওয়ার তওয়াফ দেন। তিনি বলেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দোয়া নিশ্চয়ই সাদরে কবুল হয়েছে।’ অতঃপর ইকবাল অশ্রুসজ্জল নয়নে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, ‘বাহিক অবস্থাদুশ্টে মনে হচ্ছে আমার হিজাম যাওয়া সম্ভব হবে না। বন্ধু লিখেছেন যে, দোয়া কবুল হয়েছে।’ দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।’

মৃত্যুর প্রহর ঘনিয়ে আসছে

১৭ই এপ্রিল (মৃত্যুর চার দিন আগে) কবির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু খ্যাতনামা দার্শনিকের সাথে ডারউইন ও নীটশের জটিল দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। শেষ অবস্থাতেও কবির বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি ও ভাবগভীর আলোচনার সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। ইকবাল বুঝি এবার তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার অব্বেষণকারীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন, মাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জ্ঞান গোপন করার ও নিয়ামতের মখার্থ প্রচার না করার অপরাধে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়।

ইকবালের দারুণ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে প্রবাস জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জার্মান পণ্ডিত ফ্রন ভেলসিম ২০শে এপ্রিল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে এলেন। দীর্ঘদিন পর উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন হওয়ায় পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলেন। ইকবাল ক্রান্তিহীনভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দার্শনিক মতবাদের উপর সফল আলোচনা ও মত বিনিময় হলো। মিঃ ভেলসিম বিদায়ের সময় কবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে ইকবাল বলে উঠলেন, ‘বন্ধু! আমি মুসলমান, মৃত্যুর ডয়ে বিপ্লুমাত্র ভীত বা বিচলিত নই। হাসি মুখেই তা গ্রহণ করবো।’

এদিন (২০শে এপ্রিল) উত্তর আফ্রিকায় প্রকাশিত একখানা ইংরেজী পত্রিকা ডাকযোগে কবির নামে এল। সায়র আবদুল কাদের তাঁর পাশে বসা ছিলেন। ইকবাল পত্রিকাটি পড়ে শোনানোর জন্য তাঁর হাতে দিলেন। তিনি প্রথমে একটি খবর পড়লেন যাতে লেখা ছিল :

‘উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা এক মহাসম্মেলনে ইকবাল, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ মনীষীদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছে।’ এ সংবাদ শুনে ইকবাল বলে উঠলেন, ‘আমি তো আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি। মিঃ জিন্নাহরই কেবল দায়িত্ব পালন করতে বাকী রয়েছে। এ জন্য মুসলমানদের উচিত তাঁর আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা।’

ঐ দিনই বিকেলে তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। মৃত্যু-শয্যার চার পাশে শত শত ভক্ত-অনুরক্ত কান্দছে আর আল্লাহর কাছে আশু রোগ মৃত্যুর জন্য মুনাজাত করছে। কারণ কবি তাদের মাতাপিতার মতই বেশী প্রচাঁদ পাত্র, একান্ত আপনজন। তবুও নিয়তির লেখা ফেরানো যাবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ -

‘যখন কারও মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত আগে অথবা পরে করা হবে না।’

দুনিয়ায় যত মনীষী এসেছেন আল্লাহর নিরম কারও বেলায়ই শিথিল করা হয় নি। কারণ সমস্ত সৃষ্টি মরণশীল।

আল্লাহ বলেছেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةٌ الْمَوْتِ -

প্রত্যেক সৃষ্টি জীবই মৃত্যুবরণ করবে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন :

كُلٌّ مِنْ عِلَّاهَا فَانٍ وَيَجْقَى وَجْدَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

‘এ বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে আর বাকী থাকবে শুধু তোমার মহান প্রভুর আধিপত্য ও অস্তিত্ব।’

আল্লামা ইকবালের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও দুনিয়াবাসীকে শোক সাগরে ডাসিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন।

২০শে এপ্রিলের রাত এগারটার দিকে কবি চোখ বুঁজে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট থেমে গেল। ভক্তরা বললেন, এবার তাঁকে আরামে ঘুমোতে দেয়া ভাল হবে। স্তবরাং লোকজনের ভীড়

কমানো উচিত। এটা মনে করে অনেকেই নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন। এভাবে কবিকে ফেলে মেতে কারও ইচ্ছে হচ্ছে না, তবুও কী আর করা যায়? পাশে শুধু রইলেন আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার।

রাত প্রায় শেষ। সময় আনুমানিক চারটা তিরিশ মিনিট। জীবনে সর্বশেষ বারের মতো ইকবাল ঘুম থেকে জাগলেন। জেগে পুনরায় হট্‌ফট্‌ শুরু করছেন। আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার ডাক্তারের নির্দেশিত নিয়মে রোগ যত্নে উপশম করার জন্য অপ্রাপ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ সময় (মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে) কবি নিশুর দু'লাইনের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

شان مرد مومن با تو گویم

چو مرگ آید تبسم بر لب اوشت

'ইমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে,

মৃত্যুকালে হাসিমুখে মৃত্যুকে যে বরণ করে।'

২১শে এপ্রিল ডোর পাঁচটায় কবি রাজা হাসান আখতারকে ডেকে বললেন, 'আখতার! আমি কী অবর্ণনীয় অবস্থায় আছি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।' এ কথা শুনে আখতার বললেন, 'আচ্ছা, আমি এতুপি হেঁকিম হাসান কারশীকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।' এই বলে হেঁকিমের কাছে যেতে চাইলে কবি তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিশুর কবিতা আবৃত্তি করলেন : (মৃত্যুর দশ মিনিট আগে)

سرود رفته باز آید کرماءد - نسیم از حجاز آید که ناید

سرآمد روزگار این فترے - دگر دانائی راز آید که ناید -

জানিনা অতীত সূর আবার বাজবে কি না?

হিজাযী হাওয়া পুনঃ এদিকে বইবে কি না?

এ দীন ফকীরের নিঃশেষ হলো জীবন

অপর রহস্য ভেদী (জানী) জানিনে জন্মে কি না?

তারপরও আখতার সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে হেঁকিমের কাছে ছুটলেন। পাশে আলী বখশকে রেখে গেলেন। আলী বখশ মাথার কাছে বসে একাকী শুধু আল্লাহ্-আল্লাহ্‌ যিকির করছেন। আর দোহা-কালাম পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর কবি হাত-পা প্রসারিত করে উপরের দিকে চোখ

মেলে আলী বখ্শকে ডেকে বললেন, 'আলী। আমার প্রাণ প্রদীপ একটু পরেই নিবে যাবে। আমি তোমাদের থেকে চির বিদায় নেবো। মনে কোন প্রকার কণ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও।'

এরপর ডান হাত 'ক্লাহের' উপর রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, 'আয় আল্লাহ। আমার এখানে সাংঘাতিক ব্যথা। সেই মুহূর্তে মুগ্ধমগ্নলগ্নানি কিবলার দিকে চলে পড়লো। আলী বখ্শ তৎক্ষণাৎ ডান হাত আবার বুকের উপর তুলে দিল। আল্লামা ইকবালের মুখে তখন স্মিত হাসির রেখা।

২১ এপ্রিলের সুবহে সাদিকের আলোতে পূর্বাকাশ ঝলমল হয়ে উঠলো। সময় সোয়া পাঁচটা। চারিদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে 'আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর.....আশহাদু আন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....আশহাদু আন। মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ.....আল্লামা ইকবাল আযানের সেই ধ্বনির সাথে সুর মিলিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' কলমে পড়তে পড়তে আল্লাহর সাগ্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইম্মা লিলাহি.....রাজেউন)

একটু পরেই পূর্বাকাশে উপিত হবে সোনালী কিরণ নিয়ে সূর্য। আর অন্য দিকে ইসলামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা আইনবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক শতাব্দীর প্রদীপ জ্বলন্ত মহাকাবি ইকবাল চির নিদ্রায় শায়িত হলেন, যে নিদ্রা থেকে তিনি কিয়ামতের আগে আর জাগবেন না। ভক্ত-অনুরক্ত ও শিক্ষার্থীর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন না। মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবেন না। মুসলিম জাহানের প্রতি-নিধি হয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কোন বক্তব্যই রাখবেন না।

আলী বখ্শের তখনও বিগ্রাস হয়নি যে, কবি এখন আর বেঁচে নেই। তাই সে পাশের বাড়ীতে অবস্থানরত ডঃ আব্দুল কাইউম ও শফী সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসলো। তাঁরা এসে দেখেন, ইকবাল আর আমাদের মাঝে নেই। ইতিমধ্যে রাজা হাসান আখতারও হেঁকিম নিয়ে উপস্থিত। হেঁকিম হাসান কারনী শিরা পরীক্ষা করে মৃত বনে ঘোষণা দিলেন। মৃত্যুকালে ইকবালের বয়স ছিল ষাটতিন।

১। বিশেষজ্ঞগণের মতে মানুষের বায়ু স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে রূহ (প্রাণ) রয়েছে।

সন হিসেবে ৬৫ বছর ১ মাস ২৯ দিন আর হিজরী সন হিসেবে ৬৬ বছর ১মাস ২৪ দিন।

সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর জাহোর ও পাজাবের সরকারী অফিস আদালত, কুন-কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসাসমূহ লজ্জা ঘোষণা করা হয়। এই দিনই সারা বিশ্বে এ খবর প্রচারিত হয়। সেদিন মুসলিম জাহানের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। আজামা ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম-বিশ্ব যেন দিতাকে হারালো।

কবি বলেছেন :

এমন জীবন চষে করিতে গঠন

মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিয়ে তুবন ॥

দাফন

ইহেকালের পর চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন (এম. এ.) ও ডঃ মুজাফ্ফর উদ্দীন জাহোর শাহী মসজিদের পাশে হাতুরীবাগে তাঁকে দাফন করার জ্ঞান নির্ণয় করে এলেন। কিন্তু পাজাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানের [অনুমতি ব্যতিরেকে সেখানে দাফন করা যাবে না। সুতরাং সবাই পরামর্শে মিলিত হলেন। সাইয়েদ মুহসিন শাহ, খলীফা শুজা-উদ্দীন, সা'দত আলী খান, মিয়া নিজাম উদ্দীন, মিয়া আমীর উদ্দীন, হাওলানা গোলাম মোরশেদ, হাওলানা আবদুল মজীদ, চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন, হাওলানা গোলাম রসুল মিহ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ শাহী জামে মসজিদের দিকে রওজানা হলেন। হাতে দাফনের জায়গা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। মসজিদের দরজার বাম পাশে যে জায়গাটুকু খালি ছিল সেটা তাঁরা উত্তম বিবেচনা করলেন। সুতরাং এবার দাফন করার অনুমতির জন্য তৎপর হলেন। পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল পাজাবের গভর্নরের উদ্দেশ্যে রওজানা দিলেন। তাঁরা পৌছেই গভর্নরের সাথে দেখা করে উক্ত জায়গায় তাঁর দাফনের অনুমতির জন্য আবেদন করলেন। জায়গাটি প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিখ্যাত দিল্লীর অনুমতির প্রয়োজন। গভর্নর অত্যন্ত সদানুভূতির সাথে জোর সুপারিশ করে দুপুর বারোটার মধ্যে অনুমতি আনলেন এবং বিকেল চারটার মধ্যে অনুমতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথারীতি দিয়ে বিদায় করলেন।

নামাযে জানাযা

আল্লামা ইকবালের মরদেহ গোসল দেয়া হলো। গোসল শেষে জাতিদ মনযিল থেকে বিকেল পাঁচটার সময় দাফনের উদ্দেশ্যে খাটিয়া বের করা হলো। হাযার-হাযার ডক্ত-অনুরক্তরা সবাই খাটিয়া কাঁধে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন। তাই খাটিয়ার সাথে লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে দেয়া হলো। মাতে বেণী লোক কবির কফিন বহন করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়। শাহী মসজিদের দিকে জানাযা রওয়ানা হলো। পাজাবের পড়নোরের তরফ থেকে তাঁর চীফ সেক্রেটারী ও ভাডয়াল পুরের নবাবের পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারী খাটিয়ার উপর মলুবান চানর ও ফুল স্থাপন করলেন।

রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমান জনতা খাটিয়ার উপর ফুল ও আতুর ছুঁড়তে লাগলো। সবার মধ্যে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। ডক্তরা খাটিয়ার পেছনে পেছনে হাঁটছে। মন্ত্রী-সেক্রেটারী, উকীল-ব্যারিস্টার, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী, কৃষক-মজুর ও সাধারণ মানুষ জানাযার শরীক হওয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন। শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া প্রহরাধীনে লাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত শ্বেচ্ছাসেবকও নিয়োজিত করা হয়েছিল। অবশেষে কফিন জানাযার স্থানে পৌঁছলো।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ময়দানে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু জনতা সংকুলান হবে না দেখে দিল্লী পরওয়াজার কাছে উলুজ ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সেখানে লাল পৌঁছলো। শুরু হলো নামাযের প্রস্তুতি। লোকের সমাগম বেণী হওয়াতে কাতার তিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। রাত আটটার সময় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামায শেষে মুসল্লীদের মধ্যে কবিকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্য হিড়িক পড়ে যায়। অতঃপর রাত পৌনে দশটার সময় লাহোর শাহী মসজিদের হাজুরীবাগে মহাকবি ইকবালকে দাফন করা হয়। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তিনি এখানে কবরবাসী হলেন।

ইকবালের মায়াতে

আল্লামা ইকবাল নামছাদা কবি

মরেও অমর তিনি চিরদিনের রবি।।

মহাকবি ইকবাল ছিলেন একজন অমর ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ ও রসুলের একজন দাঁটি অনুসারী, একজন মকবুল বান্দা। তাঁর রূহানী শক্তি ছিল খুবই পতিশালী। ইসলামী সূফীবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম সংস্কারক। ইমাম গায়্‌যালী (রঃ)-এর পাঁচ শত বছর পর এরকম একজন মহাপুরুষ না এলে বিংশ শতকের মুসলমান ও ইসলামের কী দুর্দশা এবং বিকৃতি ঘটতো তা বলার অবকাশ রাখে না। জীবদ্দশায় যে ইকবাল আমাদের মাঝে ছিলেন মৃত্যুর পরও তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। নিশ্চয় কয়েকটি ঘটনা বেশ করছি :

মুরতজা আহমদ খান কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কোন এক রাতে ইকবালের মাযার দিয়ারত করতে গেলেন। রাতে তাঁদের অস্তরে প্রশান্তি লাভ করে ও আল্লাহর উয় সকারিত হয়। যখন তাঁরা মাযারের সন্নিহিত পৌছলেন তখন দেখলেন—একজন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ ফকীর ইকবালের কবরের পাশে কুরআন তিলাওত করছেন। তিনি একপাড়া তিলাওত সমাপ্ত করে নিশুর আয়াতটি পড়লেন :

الا ان اوعاء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون -

‘জেনে রেখো! আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কোন ভয়-ভীতি অথবা চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।’

অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়িয়ে গেলেন আর নিশুর কবিতাটি পড়লেন :

چو ارحم به نشینی و ابد بهای - به باد آر باد بهارا -

তাঁদের মধ্যে একজন লোক এই ফকীরের পেছনে পেছনে গেলেন। ফকীর চুপে-চুপে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু ঔপর্যুপরি কয়েবার ডাকার পরও কর্ণপাত করলেন না।

মুরতজা আহমদ খান এভাবে প্রত্যেক রাতে তাঁর একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কবির মাযারে যেতেন। আরেক দিনের ঘটনা—

একজন ফকীর মাযারে মুরাক্বার রত। এ সময় তিনি অনেক

দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন। অতঃপর দোয়া শেষে ফিরে যাওয়ার সময়
নিশ্চুর আরবী কবিতা পড়লেন :

فطوى ليث كبيت العتيق - حواله من كل ارجع عتيق -

এটা বায়তুল আতীক (বায়তুল্লাহ)-এর মতো সম্মানিত। এর কাছে
পৃথিবীর প্রত্যন্ত-প্রান্তর থেকে লোকেরা ছুটে আসে।

এ কবিতা শুনে মুরতজা খান চমকে উঠলেন। কারণ তাঁর ধারণায়
এ লোক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, অথচ এ রকম তত্ত্বপূর্ণ কবিতা।

মুর্তজা খান আরো বর্ণনা করেছেন :

আমি একবার খাটে শোয়া অবস্থায় অত্যন্ত অরস্জি বোধ করতেছিলাম।
রাত তখন তিনটা। অতঃরে শুধু মরহুম কবি ইকবালের স্মৃতি উদ্ভূত
হতে লাগলো। নিসঙ্গ অবস্থায় কবির মাথারের দিকে চললাম। এক
অবর্ণনীয় আকর্ষণ আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মখন আমি
কবরের সন্নিকট পৌঁছলাম তখন লাহোরের একজন মজযুব বুয়ুর্গকে
দেখলাম। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। তিনি কবরের পাশে বসে
কি যেন পড়ছিলেন। আমিও কবরের কাছে গিয়ে দূরা ফাতিহা পড়লাম।
এ সময়ে তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর একান্ত দেখে আমি
ভয় পেয়ে গেলাম। বুয়ুর্গের চক্ৰবর্ত্ত রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে আর
অলঙ্কৃত করেছে। বিয়ারত শেষে তাঁর কাছে জিত্তেস করলাম—হুজুর
আপনি অকারণে কেন হাসছেন? এদিকে আমি ভীষণ ভয় পাইছি। তিনি
চোঁটরে জবাব দিলেন, 'তোমার জানা নেই—আজ রসূল (সঃ)-এর সওয়ারী
এদিক দিয়ে মাছি। আর আমি এখানে তাঁর সন্ধানার্থে গাহারাদার নিযুক্ত
হয়েছি।'।

আমি বুয়ুর্গের এসব কথাবার্তা শুনে আশ্চর্যাবিত হতে লাগলাম।
ভয়ে আমার শরীর থেকে ঘাম ছুটেতে লাগলো। কানপতে কানপতে তাড়াতাড়ি
বাড়ী ফিরে আসলাম। সারা রাত খাটের উপর অচেতন অবস্থায় ছিলাম।
কিন্তু তখন অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম।

ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি

ইলমুল ইকতেসাদ

‘ইলমুল ইকতেসাদ’ আল্লামা ইকবালের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নূ‘মানী এ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় ইকবাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন : প্রক্লাম্পদ জনাব মাওলানা শিবলী নূ‘মানীকে অশেষ শোকরিয়া জানাচ্ছি। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ বইয়ের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর ইলমুল ইকতেসাদ গ্রন্থটি উবু’ ডাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার বিশদ রূপরেখা এ বইয়ে আন্মোচিত হয়েছে। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

আসরারে খুদী

‘আসরারে খুদী’ ইকবালের একটি অনন্যসাধারণ কাব্য-গ্রন্থ। এটা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা জালাল উদ্দীন রামী (রঃ)-এর মসনভী শরীফের হন্দে ফাসী ভাষায় রিখিত। ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

খুদী অর্থ ব্যক্তিত্ব। মানুষের ব্যক্তিত্বের সমুন্নতি ও আগরণ ইকবাল কাব্যে অনুরণিত। আসরারে খুদীতে ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল-তত্ত্বগুলো বিশদভাবে আন্মোচিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাবনে গবেষণালব্ধ এক সুগাভকারী দার্শনিক মতবাদ এ কাব্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুবাদ ও জড়বাদী সভ্যতার উত্থানে বিপর্যস্ত মানবতার খুদীর অবমূল্যায়নে ইকবাল দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর মানসপটে অংকিত মহিমামণ্ডিত খুদীর বৈশিষ্ট্য রূপায়নে তিনি ‘আসরারে খুদী’ কাব্যখানি লিখতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দীর্ঘ দু’বছরে এটা রচনা সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

‘এটা লিখতে প্রায় দু’বছর কেটে গেল। রচনাকালে কয়েক মাসের বিরতিতে পুনরায় এ কাব্যের প্রতি ভাবাবেগে আসক্ত হয়ে পড়ি। কয়েক রবিবার (ছুটির দিন) ও কয়েক রাত বিনিময় যাপন করে লেখা শেষ করেছি। যদি আরও সুযোগ পেতাম তাহলে সামগ্রিক দিক থেকে আমার এ মসনদীটি সর্বাগীন সৌন্দর্য লাভ করতো। এর দ্বিতীয় খণ্ডও রচনা চলছে। সেটা এর চাইতে সুকৃতিত্ব সম্বলিত হবে।’

আসরারে খুদীতে কবি মানবিক সভার বিকাশের লক্ষ্যে পাখির ধান ধারণা বিবজিত তথ্যাকথিত সুফী দর্শনকে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের ডুল ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে ইসলামী দর্শনকে প্রস্ফুটিত করে ফেলেছেন। যুক্তি দর্শনের আলোকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শাস্ত্রত দর্শনের স্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রসূল (সঃ)-ই উন্নততম খুদীর (বাক্তিহের) অধিকারী। রসূলুলাহ (সঃ)-এর উসুলায়ে হাসানার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

দর দু’আয়ে নুসরাতে তারুগে আমীন উ
কাতে’ নস্লে সালাতী তারুগে উ।
দর জাহী আসীন নো আগায করদ
মসনদে আকওয়ামে পেশ দর নোরদ।
আখ কলীদে দী’ দর দুনীয়া কুশাদ
হামতু উ বতুনে উশে গীতি নযাদ।
দর নেগাহে উ য়েকে বাজা ও পুশ্ত
বা গোলায়ে খোবেশ বরয়েক ছাঁ নুশ্ত।

—আল্লাহর কাছে সাহায্যের হাত বাড়ালে
তাঁর তরবারিই ‘আমীন’ বলে,
প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি
সমাপ্তির দিকে।

হার উশ্বাটন করলেন তিনি নবীন বিদ্রোহ
ধর্মের কুজিকা ছাড়া,
বিশ্ব-গর্ভে কোন দিন জন্ম নেয়নি
তাঁর মত মহামানব।

তার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ ছিল সমান,
বসতেন তিনি আহারে তাঁর জুতোর সাথে
এক বিহানায়।

আসরারে খুদীতে ইকবালের বিশ্বজনীন মতাদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে কামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, লণ্ডন-এর প্রফেসর ডঃ আর. এ. নিকলসন বইটি *Secrets of self* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের শুরুতে দীর্ঘ ২৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি কবির খুদী দর্শনের মনোজ ব্যাখ্যা দান করেন। অনুদিত গ্রন্থটি ১৯২০ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের অন্য একজন প্রফেসর ডঃ ডিকমসন ইকবালের চিন্তাধারায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং কবির উপর জাতিপুজার অপবাদ দেন। এর জবাবে ইকবাল ডঃ আর. এ. নিকলসনের নামে মে চিঠিটি লিখেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

আমি বিশ বছরাধিক কাল ধরে বিশ্বের খাতনামা দার্শনিকদের মতবাদ অধ্যয়ন করেছি। এতে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, এগুলোর কল্যাণী আদর্শ গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমিও কোন গোড়ামি দেখাইনি। আমার ফাদী কাবাওলোর সারবত্তা ইসলামের সপক্ষে ওকালতি করা নয়। বরং মানব সমাজের জন্য বিশ্বজনীন মতাদর্শ পেশ করা ও সামাজিক সৃষ্টি ব্যবস্থার অনুসন্ধান ছিল মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে গিয়ে বর্তমান জড়বাদী দর্শনের মূল্যায়ন করে বংশ, সম্পদ-মর্যাদা ও জাতি ভেদাভেদ বিলুপ্তি সাধন আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। এসব দার্শনিকের মতবাদের দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা। দ্বিতীয়ত সামাজিক জীবনে পাখিব উন্নতি-বিমুখ হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা। সুতরাং এর কোনটিই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ইসলাম যে আদর্শ পেশ করেছে ইউরোপীয় সভ্যতায় সেটা পুরোপুরি অনুগম্য। আমরা তাদেরকে তা শেখাতে পারি।'

'আসরারে খুদী'তে ইকবাল মানুষকে কর্মবাদে উদ্দীপ্ত করেছেন। খুদীর পরিপুষ্টিতে মানুষের কর্মদক্ষতা হাসিজ হয়। এ জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সৃজনশীল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের সার্থকতাই হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে। একমাত্র ব্যক্তিহ্রবোধই পারে

কাজের গতি সফল করতে এবং জীবনের সার্থকতা ফিরিয়ে আনতে ।
কাব্য-গ্রন্থের পূর্বাভাসে তিনি বলেছেন :

যরুরা আম মেহেরে মুনীর আন মন আস্ত
সদ সাহর আন্দর কর বয়ানে মন আস্ত ।
খাকে মন রওশন তর আয জামে জম আস্ত
মুহরম আম নাজ আদহারে আরম আস্ত ।

—যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যাশ্চর্য বিভ্রাময় সূর্য আমারই ;

বন্ধো মাঝে আমার
শতক পূর্বাশার আলো ।

আমার মূলিকণা—

জামশেদের সুরা পাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে ।

তিনি আরও বলেন :

ফিকরম জাঁ আহো সর ফতরাক বস্ত
কো হোনুয আম নীস্তি বিরৌ নজসুত
সবমানা রোয়েদাহ্ শের গুলশমম,
গুল বশাখে আন্দর নেহী দর দামনম ।

—সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারুণো সবুজ ;
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুক্কায়িত আছে
কতো অক্ষুট গোলাব ।

পূর্বাভাসের শেষাংশে লিখেছেন :

শায়েরী ঘাঁ মসনভী মকসুদ নিস্ত
বুত পরস্তী বুত গীরি মকসুদ নিস্ত ।
হিন্দীম আয ফাসী বেগানা আম,
মাহে নো বাশম তী পয়মানা আম ।
ফিকর মন আয জলওয়া আশ মশহুর গশত
খামাস্তে মন শাখ নখল তুরে গশত ।

—কাব্য-সৃষ্টি নয় এ মগনভীর লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।

ভারতবাসী আমি ;

ফাসী নহে আমার মাতৃভাষা,
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
তুমি ফাসীই হলো এর বাহন।

সর্বশেষে বলেন :

খরদা বরমীনা মগীর জায় হোশমন্দ
দিল বখোকে খরদায়ে মীনা ব বন্দ।

—ওহে পাঠক। দোষ দিও না
আমার সুরা পাঠ দেখে,
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

এ কাব্যের শেষ অধ্যায়ে ইকবাল জালাময়ী ও মর্মস্পর্শী প্রার্থনার
মাধ্যমে ইতি টানেন। নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করছি :

বায়্‌ ই' আওরাক রা শীরাযা কুন
বায়্‌ আইন মুহব্বাতে তাযা কুন।
বায়্‌ মারা বর হার্মা খেদমতে তুমার
কারে খোদ বা আশেকাঁ খোদ সেকার।
রহরোয়ী বা মনখিলে তুঙ্গলীমে বখশ
ইনকে বা আয ওগলে 'লা' আগাহ কুন
আশনায়ে রময 'ইজলাহ' কুন।

—বৈধে দাও একই প্রতিতে এই বিজ্ঞিৎ পত্নরাজিকে
পুনর্জাগ্রত করে প্রেমের নীতি।

টেনে নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো

তোমার সেবায়,

ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে

প্রেম করে যারা তোমায়।

দাও আমাদেরকে ইবরাহীমের

সেই বলিষ্ঠ ইমান ,
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা ইলাহা'র অর্থ—
পরিচিত কর আমাদেরকে—
'ইল্লাল্লাহর রহস্যের সাথে ।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান বেশ কয়েকটি ভাষায় এ কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। আসরায়ে খুদী ও রুমুযে বেখুদী (দু'খণ্ড একত্রে) আবদুল ওহাব আম্বাম কর্তৃক আরবীতে অনূদিত হয়ে 'দিওয়ান আল-আসরার ওয়াল রুমুয' নামে দারুল মা'আরিফ, কাররো, মিসর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন মুহাম্মদ বখশ ওয়াসিফ। ডঃ আলী নিহাদ তারলান Esrar ve Rumuz নামে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত বইটি ১৯৫৮ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। তাহাড়া জার্মান ও ফরাসী ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে বলে জানা যায়।

রুমুযে বেখুদী

ইকবালের খুদী দর্শনের সাড়া আগানো দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'রুমুযে বেখুদী'। আসরায়ে খুদীর ভূমিকায় কবি এ গ্রন্থেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে খুদী সিরিজের ২৮ খণ্ড হিসেবে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। কাব্যের ভাষাও ফার্সী। রুমুয-ই-বেখুদী অর্থাৎ 'আমি বিলীননের রহস্য।'।

ইকবাল আসরায়ে খুদীতে নিরপেক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব জাতির শাশ্বত আদর্শ কি হবে তার আলোচনা করেছেন। আর সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন পর্শনকে তুলে ধরেছেন। রুমুয-ই-বেখুদীতে সেই শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শকে রূপায়নের লক্ষ্যে মানুষের বাস্তবতাকে আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্য ও রসুল (সঃ)-এর রিসালতের অনুসরণের মধ্যে বিলীন করে দিতে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। তাওহীদবাদে উজ্জীবিত মানব সত্তা নবীর শাশ্বত আদর্শ অনুসরণে হতে পারে 'ইনসানে কামিলের প্রতিভা'।

মানুষের স্বাধীনতা সাম্য প্রতিষ্ঠার ও কল্যাণে অন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তার নাম আল-কুরআন। পঞ্চাশতের মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন আল-কুরআনের আদর্শিক বাস্তবতা—মুর্ভ প্রতীক। ইকবাল বিশ্বব্যাপী অশান্তির

হাহাকার রূপ দেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর বেতন ও পাসন-প্রদানের জন্যে আল-কুরআন, মুহাম্মদ (সঃ) ও বিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগের প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। মুমিনদেরকে আত্মগত্বিতে বলীমান হয়ে সে আদর্শ গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবির দু'একটি কথা এখানে প্রবিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

'আমার ধারণায় ক্রমশে বেখুদী কাবাবানি লেখায় ইতি টেনে-হিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো দু'তিনটে বিষয়ের জন্যে কাবাটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। কুরআন, বায়তুল্লাহ শরীফের মাহাফা, মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে—কবিতাগুলো পরে সংযোজন করেছি। এতে গ্রন্থটির প্রকাশনার বিলম্ব ঘটেছে।

এখন আমার মনে হচ্ছে, গ্রন্থটি মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলকধাঁধায় মারা ঘূরপাক খাচ্ছে তাদেরকে পথের দিশা দেবে। কারণ আমার যতটুকু মনে হয়, ইতোপূর্বে ইসলামী জীবন দর্শনকে এত শিল্পিত অবয়বে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। ফলে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের এটা দৃঢ়ভাবে বক্তৃতা প্রত্যয় জন্মাবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা আজকে জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তা দুর্বল পাথুরির নড়বড়ে কুঁড়েঘর মাত্র। জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের রূপরেখা একমাত্র ইসলামই চূড়ান্ত করেছে, যার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ চেতনা সময় বা যুগের অতিক্রান্তিতে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে না।'

কাব্যের শুরুতে 'মিল্লাতে ইসলামিয়ার সমীপে নিবেদন' কবিতায় মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

আয় তরা হক খাতেমে আকওয়াম করদ

বরতু হো আগায রা আন্জাম করদ।

—তোমায় খোদা সৃষ্টি করেন পূর্ণতম শ্রেষ্ঠ জাতি,

তোমার মাঝে হরেক আদি সফল লজ্জি পূর্ণ জাতি।

আল-কুরআনের ভাষায় 'খায়রে উম্মতিন'-এর প্রতিধ্বনি করে কাবারূপ দিয়েছেন তিনি এ কবিতায়। খায়রে উম্মত হওয়ার অনিবার্য শর্ত হলো রসূল (সঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানা—সর্বোত্তম আদর্শের নিষ্ঠা-পূর্ণ অনুসরণ ও প্রাধানিক ভালবাসা। বস্তুত রসূল প্রেমের দহনই মুসলিম মিল্লাতের ইমানী শক্তিকে মহীয়ান-গরীয়ান করে তুলতে পারে তাই

তিনি বলেছেন :

রমযে সুখে আম পরওয়ানায়ে
দর শরর তামীর কুন কাশনায়ে ।
তরহে ইশকে আন্দায আন্দর জানে খোবীশ
তাযা কুন বা মুস্তফা পদম'। খোবীশ ।
—পতঙ্গেরই দহন দেখে মর্ম দহন শিদ্ধা করো,
অগ্নিশিখার কেন্দ্র মাঝে আবাস তব গঠন করো ।
আপন প্রাণের গোপন কোণে প্রেমের ভিত্তি গঠন করো,
নবীর সাথে শপথ তব আবার তুমি নূতন করো ।

আবার বলেছেন :

তাঁর থাকত লালাহ্ মার আরদে পদীদ
আম দমত বাদে বাহরে আয়দ পদীদ ।
—হৃদিকাতে তোমার যেন পুষ্প ফোটে নূতন করে,
তোমার শ্বাসে মধুব মলয় বয় যেন গো নূতন করে ।

পরিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত ও পদস্থখলিত মুসলমানদের জন্য সিরাতুল মুস্তা-
কীমের আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহর কাছে আহাজারির সুরে মুনাজাত
করেছেন :

আম পয়ে কওমে যখোদনা মহরমে
খাস্তীমে আম হক দাওয়াতে মাহকমে ।
দর সকুতে নীম শব নালা বৃদম
আলম আন্দর খাব ওমন ওরীয়া বৃদম ।
আনম আম সবর ও সফূ' মাহরম বৃদম
দরদ মন ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম বৃদম ।
—আম সভার অস্ত্র ধূমত এই আতির তরে,
যাহা করি—দাও হে খোদা, সবল-সফল জীবন তারে ।
অর্ধ রাতের নিষুন্ন রূপে বিলাপ করি করুণ তরে
'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' বক্ষ ভাসাই নয়ন-লোরে ।
বকিষ্ঠ মোর পরাণখানি ধৈর্য এবং শক্তিহীন
হে চিরজীব । হে চিরন্তন, জপ করছি রাগি দিন ।

কাবাগ্রন্থের ভূমিকার পাদমূলে তিনি জুদী-বেখুদীর মর্যোন্নাটন
করে বলেছেন :

নকশে গীর আন্দর দিলশ 'উ' মী শুভদ
মন বহম মী খীযদ ও 'তু' মী শুভদ ।
অবর কতা ইখতিয়ারশ মী কুনদ
আহ মুদকত মায়াহ দারশ মী কুনদ ।
নায তা নায আন্ত কুম খীযদ নেয়ায
নায হা সাযদ বহম খীযদ নেয়ায ।
দর জানা'আত খোদ শিকন পরদিদ খুদী
তায গুলবর গে চেমন গরদিদ খুদী ।
নুকতায়ে হা টো তায়গে পোলাদ আন্ত তেয
গরনমী ফাহমী বপেগ যা গুরেয ।

—‘তিনি’র মোহর অন্তরে তার অংকিত হয়,
‘আমি’ বিচূর্ণ হলেই ‘তুমি’র অভ্যাদয় ।
বাধ্যকতা ইচ্ছা তাহার খর্ব করে,
প্রেমের ধনে ধন্য সে হয় গর্ব করে ।
নয় হবে না অস্তিমান যবে চাত্ত তবে,
ভুলে যাও মান, বিনয় তান জন্ম লবে ।
সত্য সে করে আব্বিলোপ সংঘ মাঝে,
পত্র সে হবে পুষ্পমালা কানন মাঝে ।
“ভীকু লৌহ অসির মত সূক্ষ্ম কথা ।
যাও দূরে—না বুঝলে যদি গোপন বাখা ।

বাস্তব দর

বাস্তব দর কাব্য-গ্রন্থটি মূলত ইকবানের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর একটি সংকলন । ১৯২৪ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয় । শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, বিঘির রাহ, তুসুরে ইসলাম—এ চারটি দীর্ঘ কবিতাও পরবর্তীতে এর সাথে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয় । তাঁর সাড়া জাগানো কবিতাগুলো এতে সংকলিত হওয়ায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে ।

বাস্তব দরার কবিতাগুলো রচনা কালক্রম অনুসারে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

প্রথমত, কাব্য-চর্চার সূচনাকাল থেকে ১৯০৩ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ সফরে যাওয়া পর্যন্ত । এ সময়কালে আমরা ইকবানকে

একজন খাঁড়ি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে দেখি। নগা শিওরাজা (নতুন শিবালয়), হিমালায় (হিমাগড়), হিন্দুস্তানী কওনী গীত (ভারত-সঙ্গীত), হিন্দুস্তানী বাপোঁ। কী কওনী গীত (ভারতীয় বিত্তবের জাতীয় সঙ্গীত) ইত্যাদি কবিতাগুলোতে স্বদেশ-প্রেমের অনন্য অতিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপের প্রবাস জীবন (১৯০৩-১৯০৮)। প্রবাসী ইকবাল রচিত কবিতা ও ভারতীয় ইকবালের কবিতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে যাওয়ার পর দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মিথস্রল ও তিত্ত অস্তিত্বতা দেখে তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদে উৎসাহ হন। এ সময়ের রচিত জয়ীরায়ে সিসিলিয়া (সিসিলি দ্বীপ), হাকৌকত-ই-হসন (সৌন্দর্য তত্ত্ব), ওয়াটানিয়াত (ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ), তোলাবারে আলীগড় কি নাম (আলীগড় ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এ সব কবিতার ক্রমানুসারে তাঁর চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও প্রসারতার ছাপ সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ তখন থেকে পরবর্তী সব কবিতার আঞ্চলিক 'স্বদেশ-এর বিকল্প বৃহত্তর 'স্বভাতি'র সমৃদ্ধির কথাই মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

তৃতীয়ত, এ পর্যায়ের কবিতাগুলোতে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর একান্ত প্রীতি ও আন্তরিকতার নহান লানী ভাবের হয়ে রয়েছে। কবি স্বভাতির গৌরবময় অতীত ও সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের বিস্তৃত রূপরেখা দেয় করেছেন সুনিপুণভাবে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে তারানা-ই-মিল্লী (জাতীয়-সঙ্গীত), শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (অভিযোগ ও অভিযোগের জবাব) শবে মি'রাজ (মি'রাজ রজনী), দোয়া (প্রার্থনা), তুলুয়ে ইসলাম (ইসলামের উত্থান), খিঘির-ই-রাহ (পথের দিশারী), বিনায়ে ইসলামীয়া (ইসলামী রাষ্ট্র) ইত্যাদি। এ সব কবিতায় ইসলামের শাসন ও চিরস্থান আহবানের আলোকে 'হেয়ার রাজ-তোরণের' পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি।

ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ইংরেজদের পদানত হলে রাজ্যহারা মুসলমানরা অপারোক্ষ হয়ে পড়ে। তাঁদের পূজিত হতাশার স্তূপে ইকবাল নাড়া দেয়ার লক্ষে হিমালায় (হিমাগড়) কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় তিনি ভারতের মুসলমানদেরকে বিস্মৃত অতীত-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালায়ের প্রতীক চয়ন করেছেন, যাতে তারা আত্মসম্মিৎ ফিরে পায়।

কবি ক্ষমতাত্মক হস্তাশয় জাতিকে অমূল্য-নির্দেশ করে বসছেন, হিমালয় যেমন সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিসেবে তোমাদের জগৎভূমিতে শির উঠু' করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিক তেমনি তোমরাও বিশ্বের সর্বোচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন-সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, আর এই ভারত-ভূমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি। অতীত যেমন হিমালয়ের জন্যে দুখন করছে তেমনি অন্যান্য জাতির। তোমাদের জ্ঞান গরীমায় মুগ্ধ ছিল। সুতরাং তোমরা এদেশে ঘর ভাঙাই নও। কবিতার গুরুত্ব বসছেন :

আয় হিমালয়! আর ফসীলে কিণ্ডের হিন্দুস্তা
চোমতা হে তেরী দেশানী কো তুজ কত আশর্বা,
তুজ মে কুচ পরদা নেহী দেশানাহ রোমী নিনা
তু জোরী হে গনদিশে শাম ও সেহের কি ঘরখিয়া।।
এক জলওয়া থা কলীমে হুয়ে সীনা কি গিয়ে
তু তজরী হে সরাক্ষা চশমে বীনা কি গিয়ে।

—হিমালয়, হিমালয়! হে ভারত নগর-প্রাচীর,
আনত আকাশ ঢুমে সৌহ তরে তম উল্লসিত।
কাল একে দেয় নাই তব স্বয়ংসের তরা,
দিবা রাতি চরমবার্তে আজো তুমি যৌবন-শিহরা।
মুসার দৃষ্টিতে ছিল ক্ষণজ্যোতি 'সিনাই' পাহাড়,
আপাদমস্তক তুমি জ্যোতির্ময়মান নহনে সবার।

দুর্জয় সাহস ও পরিকল্পিত কর্তব্যশীলি নিয়ে এগিকে এনে ঔপনিবেশিক-
শক্তি পিছু হটেতে বাধ্য। তাই ভারতবাসীকে তিনি আন্দোলিত করে
তুলছেন :

আবর কি হাতৌ মেরে রাহওয়ার হাওয়া কি ওয়াস্তে
তাষা যা ন পে দিয়া বরকে সর কো সারনে।
আর হিমালয়! কুদী বাহী গাহ হে তু বিহী জিঃ
দস্তে কুদরত নে বনায়া হে আনাসের কি গিয়ে।
হায়ে কি করতে তরব মেরে জুমতা জাতা হে আবব।
ফীলে বে যমজীর কি সুরতে উড়া যাতা হে আবব।

—মেদেদের হাতে দেয় চুড়া তব বিদ্রোহের কথা,
তাড়িত তুরঙ্গ বায়ু হে:সে ছুটে শিহরি' সহসা।

হিমালয়, হিমালয়! তুমি সেই জীবা-মিকেতন,
 ক্রিতি তেজ আদি যেথা জীড়া-সুখে করে বিচরন।
 আহা! কিবা মহানন্দে পূজা মেঘ ভেসে চলে যায়,
 মৃত্যু করীদন যেন আকাশেতে উড়িয়া বেড়ায়।

পরিশেষে তিনি কাছিত লোকের প্রতি দিক নির্দেশ করে বলেছেন :

হাঁ দেখা দে আর ভসওওর। ফের উওহ সুবে ও শাম তু
 দৌড় পিছে কি তরফ আয়ে গারদিশে আইয়াম তু।

—হে করুনা দেখাও সে সজ্জা আর প্রভাত মিচর,
 অশীতে ফিরিয়া চল ওগো কাল আবর্তনময়।

‘হিন্দুস্থানী বাউঁ কি কওয়া গীত’ কবিতায় ভারতবাসীদের মিলন-
 সুরে আহ্বান করেছেন। সঙ্গীতের আখ্যান ভাষে কবি পাইলেন :

চিগতী নে জিস্ স্বমী মৌ পরগামে হক সুনায়া,
 নানক নে জিস্ চমন মৌ তওহীব কা গীত পায়্যা,
 ভাতারীয়ে। নে জিস্ কো আপনা ওয়াতন বানায়্যা,
 জিস্ নে হিজাবীয়ে। সে দশতে আরব চুড়ায়া,
 মেরা ওয়াতন ওহী হায়, মেরা ওয়াতন ওহী হায়।

—চিশতী গোনাগ যে ভূমিতে সত্যের বাণী প্রেমের বনে,
 ভাওহিদী গান গাহিল নানক যে দেণের শ্যাম কানন তলে,
 ভাতারবাসীরা বনেজিল যারে আপনার প্রিয় স্বদেশ বনে,
 মরুর মুক্তি তুলিল হিজাবাসীরা যাহার রিহু কোলে,
 সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি।

স্বদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন :

ইউনানীয়ে। কো জিস্ নে জীরান কর দিয়া থা
 সারে জাঁহা কো জিস্ নে ইলম ও হুনর দিয়া থা।
 মেট্রি কোন জিস্ কি হক নে ঘর কা আসর দিয়া থা
 তুরকো। কা জিস্ নে দামন হীরে। সি বহর দিয়া থা
 মেরা ওয়াতন ওহী হায়, মেরা ওয়াতন ওহী হায়।

—প্রতিভায় যার তাক লেগেছিল জানী-জগীদেব সুনান দেশে,
 সারা পৃথিবীরে দিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান যে গো, মধুর হেসে।
 পরশ যাহার তুল্য মাটির বানান বিণাল গোনার খনি,
 তুর্কবাসীরা দু’হাত ভরিয়া তুলিয়া দিল যে হীরক মনি,
 সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি।

‘হিন্দুস্তা কি কওমী গীত’—এ তিনি স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে গাইলেন :

সারা জাহাঁ সে আত্মা হিন্দুস্তা হামারা
হাম বুজবুলে হাঁয় উসকে, ইয়েহ্ গুলিস্তা হামারা

—সবার সেরা ডারত আমার .

জম্মভূমি অতুল,
সে যে আমার উপান আর
আমি তার বুলবুল ।

তসবীর-ই-দরদ কবিতায় কবি সেই পুণ্য জম্মভূমির পরাধীনতার দুঃখ
গাঁথা জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি
বিলাপ করছেন :

ইলাহী ফের মহাফ কিয়া হাঁয় ফেহাঁ দুনিয়া মে রহনে কা
হাফাতে জাবিদা মেরী নহ্ মুরগ না গাহাঁ মেরী
মেরা রোনা নেহী, রোনা হে ইয়ে সারে গুলিস্তা কা
উওহ্ গুল হো মায়, খুয়া হর গুল কি হে গোয়া খুয়া মেরী ।

—প্রভু হে, আমার কি সুখ বল তো এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকা,
জীবনে-মরণে যেখানে কোথাও অধিকার কিছু যায় না রাখা ।
আমার রোদনে শুধু আমি নই—সারা বনভূমি কাঁদিছে হায় ।
আমি সেই কুল হেমন্ত যার প্রতিটি ফুলেরে কাঁদায় ।

স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা মঞ্চে উবুড় করে কবি বলছেন :

ইয়ে খামুশী কাহাঁতক, জজ্জতে ফরিয়াপ পরদা কর
যমী পর তুহো আওর তেরী সদা হো আসমানোঁ মে ।
নহ্ সমঝো গি তু মিট জাও গি আর হিন্দোস্তা ওয়ালো
তোমারী দাস্তা তক ভী নহ্ হোগী দাস্তানোঁ মে ।

—কতকাল তার নীরব থাকিবে ? ফরিয়াপ নিয়ে দাঁড়াও সব,
মাটিতে থাকিয়া বিপুল সুনো প্রেরণ কর গো তোমার রব ।
এখনো যদি না বুঝিয়া থাক হে স্বদেশবাসী, শোন গো তবে,
আগামী দিনের ইতিহাস মাঝে নামটুকু তব নাহিক রবে ।

দ্বিতীয় ডাগের ওয়াতানিয়াত কবিতায় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের
মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন। তিনি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে
দেখলেন, দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সব বিপর্যয়ের মূল। সারা বিশ্বের

মুসলিম একটি দেহের মত। পবিত্র হাদীসেও বলা হয়েছে তাই। মু'মিনদের উপাহরণ হচ্ছে একটি শ্রাসাদের মত। এর একটি ইট যেমনি অন্যটির সাথে সম্পৃক্ত তেমনি বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তরে অবস্থানরত অব-
হেলিত মুসলমানরা জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পতাকা তলে সমবেত হউক—এটাই কবির একান্ত কাম্য। সুতরাং তিনি দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন :

উন তামা খোদাত মৌ বড়া সব সি ওয়াতন হে
জো পিরহন সি কা হে উওহ্ মহাব কা কাফন হে।

—সব দেবতার সেরা দেবতা, মাহারে কহিছ প্রদেশ তের,
বসন তাহার বনেছে কাফন আবারি বদন ইসলামের।

হো কারনে মকামী তু নতীজা হে তবাহী

রহ্ বাহর মৌ আমাদ সূরতে মাহী

—স্বানের নিকলে বন্দী যদি গো হও তুমি তবে বিলীন হবে,
অকুল জলধি মাঝে বাস কর মৌণ সম এই বিপুল ভবে।

আকওয়ামে জাহী মৌ হে রিকাবত তু ইসি সে

তসখীর হে মকসূদে তেজারত তু ইসি সে।

খালি হে সদাকত সি সিয়াসত ইসি সে

কমমোর কা ঘর হোতা হো গারত ইসি সে,

আকওয়াম মৌ মখলুক খোদা বটতী হে ইসি সে

কওমীয়ত ইসলাম কি জড় বটতী হে ইসি সে।

—জুল বুঝাবুঝি মত এরি লাগি, জাতি-বিদ্বেষ ও হানাহানি,

বাণিজ্য জাল বিস্তার লাগি প্রয়োজন হলো জয়ের গ্লানি।

ইহারি কারণ রাজনীতি হতে দূরে গালিয়েছে সত্যতা মত,

এরি ফলে আজ হতেছে ধ্বংস গরীবের প্রিয় কুটির শত।

খোদার সৃষ্টি মানুষ জাতিটি দেশের টানেতে শতধা হয়,

মহান ভ্রাতৃ ভাবধারাবাহী ইসলাম এতে হয় যে লয়।

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ বিমুখ কবি অনুপম আত্মজাতিকতাবাদে।

উদ্ধৃত হয়ে 'তারানা-ই-মিল্লী'তে বলেছেন :

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তী হামারা,

মুসলিম হেঁ হাম ওয়াতন হে সারা জাহাঁ হামারা।

তাওহীদ কি আমানত সীনে' মৌ হে হামারে,

আসা' নেহী' মিটানা নাম ও নিশা হামারা ॥

—আরব মোদের চীনও মোদের, মোদের হিন্দুস্তান,
মুসলিম মোরা বিশ্ব জগত মোদের বাসস্থান ॥
বক্ষে আমার তাওহীদের রয়েছে আমানত,
নয়কো সহজ মিটিয়ে দেওয়া মোদের নাম-নিশান।

যেহেতু কবি ও মুসলিম মিল্লাত অমিত তেজা বীর পুরুষের উত্তরা-
ধিকারী। তাদের শিরাই শহিদী খুনের ধমনী সংযুক্ত। সুতরাং তিনি
বলেছেন :

তায়গোঁ কে সায়ে মৌ হাম পল কর জোয়াঁ হোয়ে হৌ,
খজরে হেলাল কা হে কওী নিশাঁ হামারা।
মগরিব কি ওয়াদিওঁ মৌ গোজী আয়ী হামারি,
ধম্তা ন থা কিসি সে সায়েলে রওয়াঁ হামারা।

—শিশুকাল হতে হয়েছি জোয়ান তরবারি-হায়া শিরেতে ধরে,
নতুন চাঁদের খজর শোভে আমার জাতীয় পতাকা 'পরে।
ইউরোপ ভূমে গিরি-প্রস্থায় ধ্বনিয়া তুলেছি আযান সুর,
কিছুতে পারিনি ধাবমান গতি রুখতে আমার,—লক্ষ্য দূর।
মিথ্যার কাছে পরাজিত হব? দৈব বিপাক, আমি যে নই,
শতবার তুমি পরধ-নিরীখ করিয়াছ যারে, আমি সে হই।

আয় আরদে পাক তেরী হরমত পেহ্ কট্ মরে হাম
হে ছৌঁ তেরী রগৌঁ মৌ আবতক রওয়াঁ হামারা

—হে পবিত্র ভূমি। তোমার ইচ্ছা:তর জন্য করেছি মোরা রক্ত দান,
সে রক্তাশোপিত ধমনীতে তব অজিও প্রবহমান।

বাগে দরা কাব্যখানি থেকে সংকলিত কবিতার ইংরেজীতে অনুবাদ
করেছেন V. G. Kirnan। অনুদিত সংকলনের নাম 'Poems of Eqbal'.
Dr. H. T. Sorle-ও নির্বাচিত ২১টি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করে-
ছেন। তা Aberdeen University Press থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত
হয়। ডঃ মুহাম্মদ বাকির ও প্রফেসর ইউসুফ সেলিম চিশতী এ বইয়ের
দু'টি পৃথক-পৃথক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। দু'টোই ১৯৫১ সালে কাছোরে
প্রকাশিত হয়।

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া

‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’ ইকবালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতাসমূহের অন্যতম। এ দুটি কবিতাই আজম্বে হেমায়েত-ই-ইসলামের সভায় যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১২ সাগে পঠিত হয়েছিল। ‘শেকওয়া’ পাঠে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এটার জন্য ইকবালকে যে প্রবল বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অন্য কোন লেখার জন্য সে রকম হয়নি।

শেকওয়া মানে অভিযোগ—আল্লাহর নামে অভিযোগ। ৩৬টি শবকের দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে কবি তিমির-ভাঙিত দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির করুণ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহর নামে অভিযোগ পেশ করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অভিযোগগুলো অত্যন্ত শ্রুতিকটু। প্রতিবাদের মূলে ছিল এটাই।

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দুই প্রেমিক হৃদয়ের মান-অভিমান উপজীব্য বিষয়। কবিরা তেমন কোন এক প্রেমিক সত্তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে তার সঘন করে উপস্থাপন করেন। ইকবালের পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহর রবুল ‘ইম্মত’। তাঁর প্রতিই তাঁর মান-অভিমানের কথামালা। অজ্ঞাতের চরম দুর্দশা দর্শনে মর্মান্বিত হাবয় নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নালিশ করেছেন। মুসলমানের এহেন অবস্থা সত্ত্বেও তিনি কেন নিবিকার—এটাই কবির মর্মবেদনার কারণ। তিনি বলেছেন :

জুরআতে আনুম মেরী তাবে সুখন হে মুজকো
শেকওয়া আল্লাহ্ সে থাকম বদহন হে মুজকো ।

—বাক শক্তি নিভীক আমায় করছে এই ধরা ধামে,
হাই হুখে হউক তাই করছি শেকওয়া আজি খোদার নামে।

সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কবির মর্মবেদনা লাঘবের জন্য তিনি অভিযোগের পথই বেছে নিলেন। তিনি বলেন :

আয় খোপা শেকওয়া আরবাবে ওফা ভী সুনলে
খোগর হামদ্ সে তোড়া সা গেজাহ্ ভী সুনলে ।

—আল্লাহ্ ! এবার বন্ধ হুখে অনুযোগের কেজা শোন
নিতা যারা গুণ গাহিছে, বারেক তাদের গেজাহ্ শোন।

যে জাতি আজ ধ্বংসোন্মুখ সে জাতির কর্মতৎপরতা ও তাগতিভিত্তিক ফলে আল্লাহর তাওহীদ ও খিলাফত বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ আজ তারা পদদলিত হলে চরমভাবে। তাই কবিতায় প্রেমাস্পদের কাছে অভিযোগের সুরে বলছেন :

তুজকো মা'লুম হে গেতা খা কুয়ী নাম তেরা
কুওঙে বায়ুয়ে মুসলিম নে কিয়া কাম তেরা।

... ..

নকশে তাওহীদ কা হার দিল পেহ বটায়্যা হামনে
যের খজর ভী ইয়ে পরগাম সুনায়্যা হামনে।

—তুমি বল কেউ কি তোমার নাম এই মহীতলে ?
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহবলে।

.. ...

আঁকিয়াছি মানব হাদে তাওহীদের চিত্র মোরা,
খজরের তলে থেকে দিয়াছি তাওহীদের সাড়া।

এভাবে কবি মুসলিম মিজ্রাতের গৌরবময় অতীতের বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শেকওয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে কবিকে জওগাবে শেকওয়া রচনা করতে হয়। এখানে তিনি মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওনিয়ে দিয়েছেন। জাতির অধঃপতনের মূলে কি উপাদান সক্রিয় ও তাওহীদবাদী জনতার উপর আঘাত হানছে, তার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে জাতির শিরায় অনল শিহরণ জাগিয়েছেন তিনি। কবি বলেন :

কলব মেঁ সুখ নিহীঁ রাহ মেঁ এহসাস নিহীঁ
কুহ ভী পরগামে মুহাম্মদ কা তোমোঁ পাস নেহীঁ।

—রূহে নাহি অনুভূতি, অস্তরে না জাগা আছে,
মুহাম্মদের পরগামেরও মর্যাদা নাই তোদের কাছে।

রহ গেয়ী রসমে আর্থী রাহে বেজালী ন রহী
ফলসফা রহগিয়া তালকীনে গমালী ন রহী।
মসজিদোঁ মরসিয়া খাঁ হেঁ কে নামাযী ন রহী
ই য়ানী উওহ সাহেবে আওসাফে হেজাযী ন রহী।

—আযান দেওয়ার প্রথা আছে
 নাই বেলালী প্রাণের সাড়া,
 ফলসফা আর থাকলে কি হয়,
 গায্বালীর শিচ্কা ছাড়া।
 মসজিদ আজি কাঁদছে বসে
 ছায়। নামাযী কেউ তো নেই
 হেজাসী সেই ভণে আজি
 ওপাণ্ডিত কেউ তো নাই।

এভাবে তিনি জাতিকে রসুনুল্লাহ (সঃ)-র উসওয়ায়ে হাসানার অনু-
 সরন বাজিত, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আবুল আহবান আনিয়ে ইসলামী
 নব আগমনের দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। পরিশেষে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও
 দিলেন যে, তাঁর আদর্শ বাতিরেকে তোমাদের মুক্তি সুদূর পরাহত।

বালে জিবরীল

'বালে জিবরীল' (জিবরাসিলের ডানা) কাব্য গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত।
 এতে ৬১টি গহল ও ২৪টি চতুষ্পদী কবিতা রয়েছে। এ কাব্য গ্রন্থে বিশেষত
 কবি মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে চেষ্টা করেছেন। মানবতা বিধ্বংসী
 শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত মানবতাকে তিনি রক্তে দাঁড়ানোর
 আহবান জানিয়েছেন।

সমাজের নিগূহীত মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা স্বীয় স্বার্থ
 হাসিলের পন্থে চালায়, কবি সে সব শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের
 ডাক দিয়েছেন। কবির প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে :

ওঠো মেরী দুনিয়া কি গরীবো কো জাগা দো
 কাখে উমারা কি দর ও দিওরার হেলা দো।

... ..

জিস ক্ষেতে সে দহকা কো মাগস্‌সর নেহী রুখী
 ইসক্ষেত কি হার খোশাখে গুনদম কো জলা দো।

—ওঠো বিশ্বের গরীব নিঃশেষে আগিরে দাও,
 ধনীর প্রাসাদে জ্বালের কাঁপন লাগিয়ে দাও।

... ..

যে ক্ষেতের ফসল কাসাল বিশ্বাল পায় না খেতে,
 সে ক্ষেতের শসাসমূহ জ্বালিরে দাও।

বালে জিবরীলের বেশ কিছু কবিতা স্পেন সফরকালে রচিত। তাই এতে
 মসজিদে কড়োতা ইত্যাদি কবিতাগুলো আমরা দেখি। তাছাড়া জিবরীল ও
 ইবলীস, আযান, ফিরিশতৌ কি গীত, ফরমান-ই-খোদা কবিতাগুলোও উল্লেখ-

যোগ। 'ফরমান-ই-খোদা' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয়। এতে বিদ্রোহের সুর অনুরণিত। এভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় কবি দুর্নশাস্ত্র জাতির গরীব-দুখী মেধনভী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে ব্রহ্মা ও সংহতি কামনা করেছেন।

আরমুগানে হিজায

'আরমুগানে হিজায' কাব্য-গ্রন্থটি ইকবালের প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। তাঁর একান্ত আগা ছিল হিজাযের প্রধান আকর্ষণ মক্কা ও মদীনা শরীফ ঘিরারত করে এ কাব্য-গ্রন্থের সমাপ্তি টানবেন। সে জন্য তিনি গ্রন্থের অনেক জায়গা অপূর্ণ রেখেছিলেন এবং এটা প্রকাশনার কোন উদ্যোগও নেন নি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর এ সাধ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি রক্ত-ইয্যতের সাগ্নিধ্যে চলে গেলেন।

এ কাব্য গ্রন্থে কবি প্রধানত তাঁর মর্মবেদনা নিবেদন করেছেন আল্লাহ্‌র সমীপে, রসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে, জাতির খেদমতে, মানুষের খেদমতে ও সহ-গামীদের খেদমতে। আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর কথার নজরানা :

গোলামে জুয রযায়ে তু বখোয়ম

জুয আঁ রা হে কে ফরমাদী ন গোয়ম

... ..

মুসলমানে কে দর বন্দ ফিরিস আস্ত

দিলশ দর দস্তে উ আসা নয়াদ

—গোলাম আমি তোমার খুশি

ছাড়া কিছুই চাইনে, তা ঠিক।

যেই পথেতে চলতে বসে

সে পথ ছাড়া ষাইনে, তা ঠিক।

... ..

মুসলমান যে আটকে গেছে

ফিরিসিদের শিকার জালে,

ওদের নিকট থেকে হাদর

ফিরবে না আর সহজ ভালে।

রসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে মুসলিম ঔল্লাহ্‌র দুর্দশা মুক্তির জন্য দু'আ চোরাছেন :

শবে পেণ খোদা বগরীস্তম যার মুসলমানান

চরা যারন্দ ওয়া খোদারন্দ

নেদা আমদ ব ময়দানী কেহ্ ঈ কাওম
 দিলে দারুল ওয়া মাহবুবে ন দারুল ।
 ন গোয়ম আয ফরো ফালে কেহ্ বগুজ্জশ্
 কেহ্ সোদ আম শরহে আহওয়ালে কে বগুজ্জশ্ ।

—বলবো কী যে এদের কথা,
 পঙ্গু গরীব দীন বেচারা,
 দাও এদের জ্ঞানের শাবল
 ডাঙতে পারে অভ-কারা ।
 এদের নিদ্রা হাদর গরে
 দাও বুলিয়ে দয়ার পরশ
 পড়ছে এরা ঘোর বিপাকে,
 রুদ্ধ এদের গতির ধারা ।
 বলবো কতো এদের কথা
 ঠিক মতো সব বলাই যে ভার,
 দেখছো তুমি এদের গোপন
 এদের প্রকাশ—সকল ব্যাপার ।

জাতির খেদমতে তাঁর বক্তব্য :

বরো! আয সীনা কশে তকবীর খোদ রা
 বখাকে খোবীণ যন একসীরে খোদ রা ।
 জুদী রা গীর ও মাহকমে গীর ও খোশ যী
 মদা দর দস্তে কিস তকদীরে খোদ রা ।

—প্রকাশ করো তোমার বুকের
 তকবীরের ঐ উদার ধ্বনি,
 তোমার কালো এই মাটিতে
 বলাও আপন পরশ মনি ।
 নিজের গায়ে দাঁড়াও নিজে
 শক্ত হয়ে বাঁচতে শিখো,
 তোমার কপাল তুমিই গড়া
 দূর করো ওর সকল শনি ।

বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা

আজ্ঞানী ইকবাল তাঁর কাব্য সাধনার সূচনাটি জীবদ্দশায়ই অব-
লোকন করে নেহেন। ১৯০৮ সালে পাশ্চাত্যের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে
উইল্টেট ট্রিটের হিন্সিস গ্রন্থ Development of Metaphysics in persia
এবং ১৯২০ সালে আতরার হুসী কববার ইংরেজী অনুবাদ Secrets of
self প্রকাশিত হলে বিশ্বের ব্যক্তনামা তুর্নী-গনী, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী
মহলে তাঁর কালক্রমী প্রতিভার পরিচিতি সীমানা বিস্তৃত করে। ইকবাল
তখন একজন বহুত আবেগবিত-সমাবেশিত ব্যক্তিত্ব।

উপমহাদেশের অত্রভূক্ত বাংলাদেশের তুর্নী-গনী মহলেও ইকবালের
কাব্য-সাধনার হোঁচা মেলেছে। একই ভাষাভাষী ও একই ভূগুণে
অধিক সংখ্যক মুসলিম জনসংকটী বসবাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে
বিশেষ। দল কোটিরও অধিক উগ্রত মূহাব্বী (স্য) এদেশে বসবাস কর-
ছেন। স্বাভাবিকভাবে তাই জনসাধারণ তথা সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের
মাঝে ইকবাল-সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহনার প্রসঙ্গ আসে। এতদ্বা-
তামত বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা পর্ষায় কিছু তথা পেশ করতে চাই।

এক. ইকবালের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত
হয়েছে। বলাবাহুল্য দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থই পঞ্চাশ ও
ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নানা কারণে
ইকবাল-কাব্যের খুব একটা আলোচনা হয়নি। যিগত কয়েক বছর
থেকে ইকবাল-প্রতিভার পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে।

১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' (ফররুখ আহমদ অনুদিত) বইটি
স্বাধীনতার পর প্রকাশিত ইকবালের নেখা থেকে প্রথম কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে
চিহ্নিত করা যায়। তবে ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত
'শেকস্টো ও জগদাবে শেকস্টো' বইটির পুনর্মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে
বেশ কয়েকবার।

দুই. বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে ইকবাল চর্চার দীনতা সত্ত্বেও এদেশের আলিম-মাশায়খ, বক্তা-ওরিয়েন্টালিস্টদের মাধ্যমে তাঁর বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে সর্বতোভাবে। এদেশের ইসলামী সংগঠন, সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী সাহিত্যে ইকবাল কাবোর প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়। বহুতরফে বলতে গেলে আল্লামা জালাল উদ্দীন রাযী (রঃ)-এর মসনদী শরীফের পরই ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া জনপ্রিয়তা নির্ণয় করা যায়। অতএব আমরা একথা বিশ্বাসীনে তিতে বলতে পারি, আল্লামা ইকবাল এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে এতটী সুপরিচিত নাম।

তিন. ইকবাল-কাবোর অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অধুনালুপ্ত ইকবাল একাডেমী, ঢাকা (তৎপানীজন পূর্ব পাকিস্তান) অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন মরহুম মিজানুর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ মনীষী। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একাডেমীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে—১. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaphysics in Persia); মূল ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, অনুবাদ কামালুদ্দিন খান (১৩৭২ বাংলা) ২. আরমুগানে হিজায় (হেজাজের সত্ত্বগত); মূল ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, অনুঃ গোলাম সামদানী কোরাইশী, ৩. ইকবাল : দেশে বিদেশে : সম্পাদনা মিজানুর রহমান (আগ্রিন ১৩৭৪ বাংলা), কালাম-ই-ইকবাল (নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ) গোলাম মোস্তফা (১৯৫৯ ইং)।

চার. প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, আল্লামা ইকবালের ইত্তিকালের ৮ মাস পূর্বে চট্টগ্রামের মাওলানা তমীযুর রহমান 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' অনুবাদের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। অনুমতি পত্রে কবি অনুবাদ মূলানুগ এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহলে তা সমাদৃত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। (প্রঃ ভূমিকা : শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, ১৯৩৮ ইং)। দুঃখের বিষয়, অনুবাদ-কার্য শেষ হওয়ার পরও বইটি প্রকাশে পেরী হয়। ইকবালের মৃত্যুতে চট্টগ্রামে আয়োজিত শোক সভায় প্রথমত 'শেকওয়া' পঠিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এটা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এঁদের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী কর্মবীরের সহযোগিতায় এ অনুবাদ ২০,০০০ কপি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের আলিমগণ 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র বাংলা অনুবাদ আকৃতি করতে গেলেই মাওলানা তমীযুর রহমান অনুদিত বাংলা অংশই

আবৃত্তি করে আগছেন। তাঁর অনুবাদটি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হলো। অনুবাদ সাবলীল ও মুসান্নারী হয়েছে। মূল কবিতার ঝংকারও সার্থকভাবে সহজ ও সরল ভাষায় ফুটে উঠেছে। বর্তমানে এ অনুবাদ পুস্তিকাটির নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক মোহাম্মদ সুলতানও 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' অনুবাদের জন্য সরাসরি ইকবালের কাছ থেকে অনুমতি পত্র লাভ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত পুস্তকটি ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদের ভাষাও অত্যন্ত ছাদয়গ্রাহী হয়েছে। এ বইয়ের শেষভাগে আল্লামা ইকবালের সহশ্রে নিখিত 'অনুমতি পত্র' ও কবি নজরুল ইসলাম-এর স্বহস্তে লিখিত 'অভিমত' পাঠক-পাঠিকাদেরকে আনন্দে আপ্ত করে। নজরুলের অভিমতটি এ ক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য :

'সুলতান এর 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'। উর্দু-ভাষী ডঃরতবাসীর মুখে মুখে আজ শেকওয়ার বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুর্লভ মনে করেই আমি এতে হাতে দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিগমিত ছলাম। অরিজিন্যাল ডাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাল সাবলীল সহজ গতিভঙ্গী দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে বাউলার শাড়ির অবস্তরনে যেন আরো বেণী মানিয়েছে। (স্বাক্ষর : নজরুল ইসলাম, ১৫ই ডার ১৩৭৪ বাংলা)।

১৯৮৪ সালে অনুবাদ গ্রন্থটির ত্রয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ. বাংলা ভাষায় অনূদিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার অনুবাদই হয়েছে সর্বাধিক। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, স্বাধীনতা (১৯৭১)-পূর্বকালে ছয়জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদকরা হলেন—ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রকাশকাল ১৯৪৫), আশরাফ আলী খান (প্রকাশকাল ১৯৪৬), মীজানুর রহমান (প্রকাশকাল ১৯৫৩), আশরাফ আলী খান (প্রকাশকাল ১৯৫৫), মাওলানা তমীমুর রহমান (প্রকাশকাল ১৯৬৩ শেকওয়া, ১৯৪৬

অত্যাধিক শেকওয়া) মনীরুদ্দীন ইউসুফ (প্রকাশকাল ১৯৬০)। বর্তমানেও উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থগুলো প্রচলিত রয়েছে।

দ্বয়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইকবালের জীবন ও কর্মের উপর রচিত বই এবং অনুবাদ গ্রন্থের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

১. ইকবাল : জীবনী ও বাণী - ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাঁস পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪৯, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

২. মহাকাবি ইকবাল : লতীফা রশীদ, ১৩৫৪ বাংলা, বুলবুল ধর বুক হাউস, ঢাকা।

৩. ইকবাল : ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৫৮, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স।

৪. আজ্জামা ইকবাল : আবু বোহান্নুর মোহাম্মদ, পাক কিতাব ঘর, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।

৫. ইকবালের শিক্ষা দর্শন : মূল : খাজা গোলাম সাইয়েদাঈন, অনুঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, অনুবাদ কাল ১৯৪৫-৪৬, প্রকাশকাল ১৯৫৮, মাহফুজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৬. ইকবাল : দেশে-বিদেশে : সম্পাদনা—মীহানুর রহমান, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা, (পূর্ব পাকিস্তান), ১৯৬২ ইং।

৭. আসরায়ে শুনী : ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনুঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, আল-হামরা লাইব্রেরী, কলিকাতা। তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৪৫।

৮. রুমূথে বেধুনী : ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, অনুবাদ : আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৯. হেজাযের সওয়াহিদ (আরমুগানে হিজাজ) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল অনুঃ গোলাম সামদানী কোরাইশী, ইকবাল একাডেমী, কলকাতা, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৬২।

১০. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaphysics in persia) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনুঃ কামালুদ্দীন খান, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৩৭২ বাংলা।

১১. কালাম-ই-ইকবাল : (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) অনু : গোলাম মোস্তফা, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৫৯।
১২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন (The Reconstruction of Religious Thought in Islam) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনু : কামালুদ্দীন খান, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আ. ফ. মু. আবদুল হক ফরীদী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩।
১৩. ইকবালের কাব্য-সংকলন : মনির উদ্দীন ইউসুফ : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।
১৪. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা : (অনুবাদ) ফররুখ আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮১।
১৫. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

পাশ্চাত্যে ইকবাল-চর্চা

ইউরোপের প্রবাস জীবনে (১৯০৩—১৯০৮) ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। প্রফেসর টমাস আরনল্ডের প্রিয় ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচিতির পথ আরো সগম হয়। তাই আমরা দেখি, মাত্র তিন বছর ইউরোপ থেকে তিনি বিপুল সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। সে সময় প্রাচ্য কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে ইকবালের সমাদর সবার শীর্ষে স্থান পায়। উটরেই ডিগ্রী লাভের পর তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৯০৭-১৯০৮) তে প্রফেসর হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ সালে ডিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েও অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি।

লন্ডনে ১৯০৮ সালে তাঁর থিসিস 'Development of Metaphysics in Persia', ১৯২০ সালে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ আর. এ. নিকলসন কর্তৃক 'আসরারে লুদী'র অনূদিত 'Secrets of self', ১৯২৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam' প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর লুদী-দর্শন পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক মানসে এক নবতর জীবনবোধের সন্ধান দেয়। তাঁর মননশীল সাহিত্য তাদের চিন্তা-কর্ষণ করে।

ইকবালের মৃত্যুতে প্রাচ্যবাসী যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্য-বাসীও শোকাহত হয়েছিলেন। রুটেন, ওয়াশিংটন ও জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইকবাল সোসাইটি'। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর প্রতিথযণা লেখকদের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিবরণ পেশ করছি :

১. জার্মান ভাষায়—M hammad Iqbal and Welt des Islam (Köln 19৫9) by Baymirza Hayit.

২. ফিনিশ ভাষায়—Muhammad Iqbal (Helsinki, Finland 1954) by Henri Broms.

৩. ফরাসী ভাষায়—Luce claudé Maitre রিখিত Introduction a la pensee d' Iqbal (paris 1955)

৪. Dictionary of National Biography (1931-1940) তে Iqbal শীর্ষক sir H. A. R. Gibb এর লেখা প্রবন্ধ (Oxford University press, 1950) প্রকাশিত।

৫. Iqbal : His Art and Thought—S. A. Vahid, ১৯৫৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ইকবাল সাহিত্যের অধিকান্যই অনুদিত হয়েছে। বাটের দশক পর্যন্ত যে সব বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

ইংরেজী ভাষায় :

1. Secrets of self—Dr. R. A. Nicholson, 'আসরারে খুদী'র অনুবাদ ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

2. Mysteries of Selflessness—A. J. Arberry, 'রুমুযে বেখুদী'র অনুবাদ ১৯৩৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

3. Poems of Iqbal—V. S. Kiernan. জরবে কলীম থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

4. Notes on Iqbal's Asrar-i-Khudi—Arthur J. Arberry, 'আসরারে খুদী'র ভাষা। ১৯৫২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

৫. Poems of Iqbal—Dr. H. T. Sorla, Aberdeen University press থেকে ১৯৩৩ সালে মুদ্রিত হয়। বাগে দরা কাব্যের নির্বাচিত ২১টি কবিতার অনুবাদ।

6. The Tulip of Sinai—Prof A. J. Arberry (London 1947) পঞ্চমে মশারিক-এর অনুবাদ।

7. Persian Psalms—A. J. Arberry, যবুরে আজম-এর ইংরেজী অনুবাদ। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ইতালী ভাষায় :

1. Il Poema celeste by Aissandro Bausani. (Roma 1952).

2. Il Modernismo Musulmano dula Indiano Sir Mohammad Iqbal. (Roma 1939).

উল্লেখ্য আমাদের সংগৃহীত তথ্যে বাটের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরও বই প্রকাশিত হয়েছে।

Azadul ইকবাল-রচনাবলী

ইকবালের জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে ১৬ টি গ্রন্থ, ৪৫টি কবিতা, ৩০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিচেন এগুলোর বিস্তৃত বিবরণ বেন করা গেল :

গ্রন্থ

১. عالم الاقتصاد (ইলমুল ইকতেসাদ) ১৯০৩ সাল, লাহোর।
২. Development of Metaphysics in Persia. ১৯০৮ সাল, লন্ডন।
৩. شکوه وجواب شکوه (শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া) ১৯১২ সাল, লাহোর।
৪. آرزو حودی (আসরায়ে খুদী) ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।
৫. আখবার-ই-ইকবাল, লাহোর, ১৯১৮।
৬. رموز بهمنودی (রুমুযে বেহমুদী) ১৯১৮ সাল, লাহোর।
৭. طلوع اسلام (তুলুয়ে ইসলাম) ১৯২১ সালে এবং خضرآه (খযর রাহ) ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ গ্রন্থ দু'টি (বাসে দর) কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।
৮. پیام مشرق (পয়ামে মশরিক) ১৯২৩ সাল, লাহোর।
৯. بانگ درا (বাসে দর) ১৯২৪ সাল, লাহোর।
১০. زبور عجم (যবুরে আজম) ১৯২৭ সাল, লাহোর।
১১. The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. ১৯৩১ সালে লাহোর প্রকাশিত হয়।
১২. جاوید نامه (জাউদ নামা) লাহোর, ১৯৩২ সাল।
১৩. بال جبرئیل (বালে জিব্রীল) ১৯৩৫ সাল, লাহোর।
১৪. ضرب کلام (যরবে কলীয) এপ্রিল ১৯৩৬ সাল, লাহোর।

১৫. পচ ছে বায়দ করদ আর আকওয়ামে শরক, লাহোর, ১৯৩৬।
 ১৬. *ارمغان حجاز* (আরমুগানে হিজাজ) লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।
 উল্লেখ্য, এ ঘণ্টা ছাড়া বাকী ১৫টি গ্রন্থ কবির জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়।

কবিতা

(বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশিত)

- ১। আবদুল কাদির কি নাম—মাসিক মাখযান, লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯০৩।
- ২। আবর-ই-কুসর—মাসিক মাখযান, লাহোর, নভেম্বর, ১৯০১।
- ৩। আককার-ই-ফলক গয়মা—মুরাভা, লক্ষৌ, জানু, ১৯২৯।
- ৪। আ'লা হযরত মালিক-ই-মুয়াজ্জাম কি পয়গাম কা জওয়াব—পাজাব
 কি তুরফ সে—হক, ২৭শে জুলাই, ১৯১৮।
- ৫। বাব্বা আওর শামা—মাসিক মাখযান, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।
- ৬। দরবার-ই-ডাওয়ালপুর ঐ, নভেম্বর, ১৯০৩।
- ৭। দরদ-ই-ইশক—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩।
- ৮। দো সিতারে—মাসিক মাখযান, লাহোর, আগস্ট, ১৯০৯।
- ৯। দু'আ—ফিরদাউস, লাহোর, জুলাই, ১৯২৮।
- ১০। এক দরদমন্দ দিল কি আরয—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই
 আগস্ট, ১৯০৩।
- ১১। এক পরিণা আওর জুগনু—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুলাই, ১৯০৫।
- ১২। এক সাহেবে দিল কি আরয—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই
 ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩।
- ১৩। এক ইয়াতীম বাছে কি ফরিদাদ-পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, এপ্রিল
 ১৯০২।
- ১৪। শাম কি আমদ ঐ
- ১৫। গাওহার-ই-নাহাব—তুলুয়ে ইসলাম, দিল্লী, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।
- ১৬। গায়ব মাতবুয়া কালাম—ফিরদাউস, লাহোর, ১৯২৯।
- ১৭। গযল—এশিয়া, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯০৮।
- ১৮। গযল—কাল্পাফ, অমৃতসর/২১ মার্চ, ১৯২৫।
- ১৯। গোরস্তানে শাহী, মাসিক মাখযান, লাহোর, জুন, ১৯১০।

- ২০। হামারা দেশ, মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০৯।
- ২১। হুসম ও জিবাল, ঐ মার্চ, ১৯০৬।
- ২২। ইনসান ও বহুমে কুদরত, পাজা-ই-ফাওলাদ, ২৯, অক্টোবর, ১৯০৫।
- ২৩। ইকবাল কি পো নজ্জমে—মাসিক সাকী, করাচী, জুন, ১৯০২।
- ২৪। জিহাদ—মাসিক বালাগ, অমৃতসর, এপ্রিল, ১৯৩৭।
- ২৫। খামুশী—মাসিক হুমায়েন, লাহোর, মার্চ, ১৯২২।
- ২৬। খত-ই-মনজুম—পাজা-ই ফাওলাদ, লাহোর, জুলাই, ১৯০২।
- ২৭। খিলাফত আউর তুর্ক ও আরব—মাসিক মা'যারিফ, আজমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪।
- ২৮। খুফতাপানে খাক সে ইসতিফুসার—মাসিক মাখযান, লাহোর, নভেম্বর, ১৯০৫।
- ২৯। কিনার-ই-রাবী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৫।
- ৩০। কোহিস্তান-ই-হিমালী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৫।
- ৩১। মাউজের দরীয়া—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, নভেম্বর, ১৯২৮।
- ৩২। মৌলাদ-ই-আদম—মাসিক তুলুয়ে ইসলাম, দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৩৮।
- ৩৩। মীর্খা গালিব—মাসিক আদিব, এলাহাবাদ, জুলাই, ১৯১২।
- ৩৪। মুহাব্বাত—মাসিক মাখযান, লাহোর, জানুয়ারী, ১৯০৬।
- ৩৫। নাজা-ই-ফিরাক— ঐ, মাসিক মাখযান, লাহোর, মে, ১৯০৩।
(ইকবালের অন্যতম শিক্ষক স্যার টমাস আরনল্ডের বিদায় উপলক্ষে রচিত।)
- ৩৬। নাওয়া-ই-ইকবাল—মাসিক যুরাক্ক, লক্ষ্মৌ, এপ্রিল, ১৯২৬।
- ৩৭। মায় কোন্ হোঁ এবং দুনিয়া কিয়া হ্যায়—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ১৯০২।
- ৩৮। পয়গাম-ই-ইলক—মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০৮।
- ৩৯। রুবাইয়াত—কা'মীরী গেজেট, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০৯।
- ৪০। রুহুসাত আয় বহুমে জাহাঁ—মাসিক মাখযান, লাহোর, মার্চ, ১৯০৪।
- ৪১। সেঈদীয়ার—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯১৭।
- ৪২। শিমাসা-ই-রায—মাসিক সুফী, মার্চ ১৯১৩।
- ৪৩। শো বহিরা—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুন, ১৯১০।

৪৪। জুবান-ই-হাস—পাজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, মার্চ, ১৯০২।

৪৫। গারগাহ ই শাওরান যা হিনান ই-পিব, মাসিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯১১।

প্রবন্ধ

(উর্দু)

১। আবাদী—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৪। কবির ইলমুল ইকতেসাদ বইয়ের অংশ বিশেষ।

২। আসরারে খুদী আওর তাসাউফ—ভাকিল, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯১৬।

৩। আওরতো কি মৃত্তাআল্লিক দিল সচ্প রায়ি—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, ২১ জানুয়ারী, ১৯৩০।

৪। ইসতিহকাম আওর মিল্লাত-মাসিক তুলুয়ে ইসলাম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

৫। জনাব রিসালতে মা'ব কি আবাদী তবসিরাহ—মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল।

৬। খাজা আজীজ উদ্দীন আযীয লঙ্কৌবী কি ফার্সী শায়েরী কি মৃত্তা-আল্লিক রায়—মাসিক নায়ালাজ কি কায়ালা, লাহোর, সালনামাহ ১৯৩২।

৭। কিয়া কওমীয়ত কি বুনিয়াদ জিওগরাফিয়া-ই-ওয়াতন পর হায়া—দৈনিক ইনকিলাব, লাহোর, মার্চ ১০, ১৯৩৮।

৮। মাহফিল-ই-মীলাদুন্নবী (সঃ)—ইসলামী তারাকিব, করাচী, ১৯৫২।

৯। মুলমান্নো কা ইমতেহান—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, জানুয়ারী ১৪, ১৯১৩।

১০। নবী-ই-করীম কি পেশগী তাসাউফ-ই-উজ্জুদিয়াহ কি মৃত্তাআল্লিক-ভাকিল, অমৃতসর, ডিসেম্বর, ১৯১৬।

১১। পয়আম-ই-আখিরীন-মিহির-ই-নিমরোজ, করাচী, এপ্রিল, ১৯৬০।

১২। কাওমী জিন্দগী—মাসিক মাখযান, লাহোর, জুলাই, ১৯১৭।

১৩। শাহী কমিশন কি মৃত্তাআল্লিক রায়—আখবার কাশ্মিরী, লাহোর, নভেম্বর ১৪, ১৯২৭।

১৪। সির-ই-খুদী—ভাকিল, অমৃতসর, ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯১৬। আগ্রা আখবার, আগ্রা, মার্চ ৭, ১৯১৬।

- ১৫। স্বদেশী ভারীখ আউর আখবারান-ই-ইসলাম, মাসিক মামানা, কান-পুর, মে, ১৯০৬।
- ১৬। তাকসীম-ই-ফিলিস্তীন—মাসিক পয়গাম-ই-হক লাহোর, জানুয়ারী ১৯৩৮।

(ইংরেজী)

1. A Plea for deeper study of the Muslim scientists—Quarterly Islamic Culture, Haiderabad, Deccan, April 1929.
2. Doctrine of Absolute Unity as explained by Abdul Algillani—monthly Indian Antiquary, Bombay, Sept 1900.
3. Is Religion Possible? in the proceedings of the Aristotolian Society প্রবন্ধটি পরবর্তীতে The Raconstruction of Religious Thoughts in Islam বইয়ে সংযোজিত হয়।
4. Islam and Ahmadism—Fortnightly Islam, Lahore, January 22, 1936.
5. Islam and khilafat—Sociological Review, London, 1908.
6. Islam and Qadianism—Anti-Qadian Laagua, Lahore.
7. Islam is a moral political ideal -Hindustan Review, 1936.
8. Khushal Khen Khattak—quarterly Islamic Culture, Haiderabad, Daccan, 1928.
9. Mc. Teggart's Philosophy—Indian Arts and Letters, 1932.
10. Notes on Muslim Democracy, Naw Era, 1916.
11. On Corporeal Resurrection after Deeth, Muslim Revival, Lahora, Saptamber 1932.
12. Political Thought in Islam—Hindustan Review, December 1910 and January 1911.
13. Self in the Light of Relativity-Crescant, Lehora 1925.
14. Soma study Notes-Muslim Revival, Lehora, Sept. 1932.

জীবনপঞ্জী

জন্ম : ২৪শে ফিলফাজ্জ ১২৮৯ হিজরী মূতাবিক ৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭
(মতান্তরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) ইংরেজী রোজ শুক্রবার।

শিক্ষা : ৫ বছর বয়সে মজ্বে ভর্তি।

১৮৮৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত।

১৮৮৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৮৯১ সালে কচ মিশন হাইস্কুল (সিয়ালকোট) থেকে অষ্টম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে 'মেডেল' পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৩—উক্ত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৯৫—সিয়ালকোট কচ মিশন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

১৮৯৬—জীবনের সর্বপ্রথম মুশারেরা (কবিতানুষ্ঠান)-এ অংশগ্রহণ।

১৮৯৭—লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ বি. এ. ডিগ্রী লাভ এবং জামাল উদ্দীন পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৮৯৯—উক্ত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এম. এ. (দর্শন) পাশ করেন এবং লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা শুরু।

১৯০০—লাহোর আজুমান হেমায়েতে ইসলামের সভায় 'নাগায়ে ইয়াতীম' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি।

১৯০১—এপ্রিল মাসে লাহোরের সর্বশ্রেষ্ঠ উনু পত্রিকা মাখযান-এ হিমা-লাহ কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯০০-১৯০৩—লাহোরের বাটী পরগনাধার বসবাস।

১৯০৬—লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।

১৯০৫—দিল্লী নিয়াম উদ্দীন আওলিয়ার মাযার খিয়ারত এবং পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার জন্য জার্মানী গমন।

১৯০৭—জার্মানীর মিউনিক ইউনিভার্সিটি থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ।

১৯০৭-১৯০৮—লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা।

১৯০৮—বার-এট-ল (লণ্ডন) ডিগ্রী লাভ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ২২শে অক্টোবর থেকে লাহোরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন।

১৯১১—লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসা করার অত্রিপ্রায়ে আবেদন পত্র পেশ করেন। এ বছরই তিনি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্য 'শেকওয়া' লাহোর আজুমায়ে হেমায়েত ইসলামের সভায় আবৃত্তি করেন। এ ছাড়া তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের (দর্শন বিভাগে) অধ্যাপনাও করতেন।

১৯০৮-১৯২১—লাহোর আনারকলিতে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সভা ও কবিতানুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

১৯১৫ 'তারীখে হিন্দ' রচনা করেন।

১৯১৪—৯ই নভেম্বর সিয়ালকোটে তাঁর আশ্মাজান ইমাম বিবি ইত্তেকাল করেন।

১৯২০—কম্বীর শ্রীনগর সফর।

১৯২২—বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'সার' উপধিতে ভূষিত হন।

১৯২৩—১ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক রচনা।

১৯২৪-১৯২৮—পাজাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

১৯২৫—লাহোর ইসলামিয়া কলেজে 'ইসলাম ও ব্রিহাদ' শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দান।

১৯২৮—মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও মহিশূর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বক্তৃতা প্রদান।

১৯৩০—আব্বাজান শেখ নূর মুহাম্মদ ইত্তেকাল করেন।

অজ-ইন্দিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩১—ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত 'মু'তামারি আলমে ইসলামী' (ইসলামী বিশ্ব সম্মেলন)-এ যোগদান। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েক অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান।

১৯৩২—প্যারিসে নেপোলিয়নের সমাধি পরিদর্শন এবং প্রথাত ধর্ম-
তত্ত্ববিদ Messignon-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৭ই নভেম্বর থেকে ২২শে
ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান।
ইটালী (রোম)-এর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ। স্পেনে 'দোয়া' 'মসজিদে
কর্ডোভা' প্রভৃতি কবিতা রচনা।

১৯৩৩—অক্টোবর মাসে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানি-
স্তান সফর।

লাহোর পাক্ষাৎ ইউনিভার্সিটি' ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত
করেন।

১৯৩১—শারীরিক অসুস্থতার ফলে আইন বাবসা পরিত্যাগ।

১৯৩৫—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর পদে নিয়োগ
প্রাপ্তি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অপারগতা সূচক জবাব প্রেরণ।
'ওসীয়াত নামা' লিপিবদ্ধ করেন।

১৯৩৬—আলীগড় ইউনিভার্সিটি ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

১৯৩৭—এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে।

১৯৩৮—মিসরের জামেয়া আজহারের শিক্ষাবিদগণ লাহোরে তাঁর
সাথে সাক্ষাৎ করেন। শারীরিক অসুস্থতার ফলে অবকাশ স্থাপন।

১৯৩৮—জাহাঙ্গীর লাল নেহেরু তাঁর সাথে জানুয়ারী মাসে সাক্ষাৎ
করেন।

২১শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর
সান্নিধ্যে মিলিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী

- (১) সীরাতে ইকবাল (سيرت اقبال) প্রফেসর তাহের ফারুকী, কওমী কুতুব খানা, লাহোর, ১৯৩৯।
- (২) ইকবালিয়াত কা তামকীদী জায়েয়াহ্ (اقبالیات کا تنقیدی جائزہ) আহসদ মিয়া আখতার, ইকবাল একাডেমী, করাচী।
- (৩) আপরারে খুদী (اسرار خودی) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত।
- (৪) রুমূযে বেখুদী (রহুজ - روموز - بخودی) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী অনূদিত।
- (৫) বাগে দরা (باغک دریا) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : মনীর উদ্দীন ইউসুফ অনূদিত।
- (৬) শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (شکوہ و جواب شکوہ) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : মাওলানা তমীমুর রহমান অনূদিত।
- (৭) আরমুগানে হিজায় (ارمغان حجاز) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল : গোলাম সামদানী কোরাইশী অনূদিত।
- (৮) বালে জিবরীল (بال جبریل) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল।
- (৯) তারীখে ইসলাম : মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেরী (রঃ)।
- (১০) আমাদের কবি : আ. ন. ম. বজলুর রশীদ।
- (১১) ইকবাল আওর মওদুদী : তাকবুলী মৃতালি'আ—প্রফেসর উমর হায়াত খান, লাহোর।
- (12) Bibliography of Iqbal : K. A. Waheed, Iqbal Academy, Karachi.



কডোহা মসজিদে নামাযরত ইকবাল



আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল



제임스 E. 로버트슨



হাসিনা টেকরাজ

Delaware

21st June 1936

My dear Jagjitrai,

Thanks for your letter which I read a moment ago.
your summary is excellent & I have got nothing
to add. My ~~book~~ will, I hope, be published about
the end of June & I will send you ~~copy~~ the
manuscript as soon as I can. Your collection has
a part which is in ~~it~~. You may not find
anything new in it; but if it reaches you
in time you may read the portion mentioned
above.

I suppose you are aware of the educational
implications of Leibniz's monadism. According to
him the monad (the mind of man) is a closed window
impassable to receiving external & absorbing external
forces. My view is that the monad is essentially
amissile in its nature. There is a great danger
(دائره البرهان الجبري). While it kills & destroys it also creates
& brings out the hidden possibilities of things. The
possibility of change is the greatest mark of order
in his present surroundings.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

P.S. My general health has much improved.
The improvement in the voice is slow.

S.C.

رومی اقبال

روی خود بنمود پس حق مرثیت

کو محرف کسبیلوی قرآن مجت



দিল্লী ব্রসার্টন বিদ্যালয়-এর কলকাতা-চিঠি আদায়। কলী ৬ ইকরাৎ



শ্রী অনিস হাসান (জাহার)-এর কালি-কলম ছেঁট